প্রবন্ধ

জাভা-যাত্রীর পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচিপত্র

- ১ 2
- ২ 7
- ৩ 14
- ৪ 18
- ৫ 23
- ৬ 28
- ৭ 29
- ৮ 35
- ৯ 37
- ১০ 45
- ১১ 53
- ১২ 62
- ১৩ 70
- ১৪ 77
- ১৫ 84
- ১৬ 86
- ১৭ 89
- ১৮ 92
- ১৯ 94
- ২০ 98
- ২১ 102

১

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা যখন আরম্ভ করা গেল আকাশ থেকে বর্ষার পর্দা তখন সরিয়ে দিয়েছে; সূর্য আমাকে অভিনন্দন করলেন। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত যতদূর গেলুম রেলগাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে মনে হল, পৃথিবীতে সবুজের বান ডেকেছে; শ্যামলের বাঁশিতে তানের পর তান লাগছে, তার আর বিরাম নেই। খেতে খেতে নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং, বনে বনে রসপরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ। ধরণীর বুকের থেকে অহল্যা জেগে উঠেছেন; নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ লাগল।

প্রকৃতির এই নব জীবনের উৎসবে রূপের উত্তরে রসের গান গাবার জন্যেই আমি এসেছিলুম; এই কথাই কেবল মনে পড়ে। কাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তার দরকার কী। বলে, ওটা শৌখিনতা। অর্থাৎ, এই প্রয়োজনের সংসারে আমরা বাহুল্যর দলে। তাতে লজ্জা পাব না। কেননা, এই বাহুল্যের দ্বারাই আত্মপরিচয়।

হিসাবি লোকেরা একটা কথা বারবার ভুলে যায় যে, প্রচুরের সাধনাতেই প্রয়োজনের সিদ্ধি; এই আষাঢ়ের পৃথিবীতে সেই কথাটাই জানালো। আমি চাই ফসল, যেটুকুতে আমার পেট ভরবে। সেই স্বল্প প্রত্যাশাকে মূর্তিমান দেখি তখনই যখন বর্ষণে অভিষিক্ত মাটির ভাণ্ডারে শ্যামল ঐশ্বর্য আমার প্রয়োজনকে অনেক বেশি ছাপিয়ে পড়ে। মুষ্টিভিক্ষাও জোটে না যখন ধনের সংকীর্ণতা সেই মুষ্টিকে না ছাড়িয়ে যায়। প্রাণের কারবারে প্রাণের মুনফাটাই লক্ষ্য, এই মুনফাটাই বাহুল্য। আমাদের সন্ন্যাসী মানুষেরা এই বাহুল্যটাকে নিন্দা করে; এই বাহুল্যকেই নিয়ে কবিদের উৎসব। খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত যদি থাকে তবেই সাহস করে খরচপত্র চলে, এই কথাটা মানি বলে আমরা মুনফা চাই। সেটা

ভোগের বাহুল্যের জন্যে নয়, সেটা সাহসের আনন্দের জন্যে। মানুষের বুকের পাটা যাতে বাড়ে তাতেই মানুষকে কৃতার্থ করে।

বর্তমান যুগে য়ুরোপেই মানুষকে দেখি যার প্রাণের মুনফা নানা খাতায় কেবলই বেড়ে চলেছে। এইজন্যেই পৃথিবীতে এত ঘটা করে সে আলো জ্বালল। সেই আলোতে সে সকল দিকে প্রকাশমান। অল্প তেলে কেবল একটি মাত্র প্রদীপে ঘরের কাজ চলে যায়, কিন্তু পুরো মানুষটা তাতে অপ্রকাশিত থাকে। এই অপ্রকাশ অস্তিত্বের কার্পণ্য, কম করে থাকা। এটা মানবসত্যের অবসাদ। জীবলোকে মানুষরা জ্যোতিষ্কজাতীয়; জন্তুরা কেবলমাত্র বেঁচে থাকে, তাদের অস্তিত্ব দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু, মানুষ কেবল-যে আত্মরক্ষা করবে তা নয়, সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রকাশের জন্যে আত্মার দীপ্তি চাই। অস্তিত্বের প্রাচুর্য থেকে, অস্তিত্বের ঐশ্বর্য থেকেই এই দীপ্তি। বর্তমান যুগে য়ুরোপই সকল দিকে আপনার রশ্মি বিকীর্ণ করেছে; তাই মানুষ সেখানে কেবল-যে টিঁকে আছে তা নয়, টিঁকে থাকার চেয়ে আরো অনেক বেশি করে আছে। পর্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। য়ুরোপে জীবন অপর্যাপ্ত।

এটাতে আমি মনে দুঃখ করি নে। কারণ, যে-দেশেই যে-কালেই মানুষ কৃতার্থ হোক-না কেন, সকল দেশের সকল কালের মানুষকেই সে কৃতার্থ করে। য়ুরোপ আজ প্রাণপ্রাচুর্যে সমস্ত পৃথিবীকেই স্পর্শ করেছে। সর্বত্রই মানুষের সুপ্ত শক্তির দ্বারে তার আঘাত এসে পড়ল। প্রভূতের দ্বারাই তার প্রভাব।

য়ুরোপ সর্বদেশ সর্বকালকে- যে স্পর্শ করেছে সে তার কোন্ সত্য দ্বারা। তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে-বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার করে কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে সে একাট বিপুল শক্তি। এইখানে তার চাওয়ার অন্ত নেই, তার পাওয়াও সেই পরিমাণে। গত বছর য়ুরোপ থেকে আসবার সময় একটি জর্মন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁর অল্পবয়সের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আসছিলেন। মধ্যভারতের আরণ্য প্রদেশে যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে দুবৎসর তাদের মধ্যে

বাস করে তাদের রীতিনীতি তন্ন তন্ন করে জানতে চান। এরই জন্যে তাঁরা দুজনে প্রাণ পণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। মানুষসম্বন্ধে মানুষকে আরো জানতে হবে, সেই আরো জানা বর্বর জাতির সীমার কাছে এসেও থামে না। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এইরকম সংঘবদ্ধ করে জানা, ব্যূহবদ্ধ করে সংগ্রহ করা, জানবার সাধনায় মনকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করা, এতে করে মানুষ যে কত প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে য়ুরোপে গেলে তা বুঝতে পারা যায়। এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে য়ুরোপ মানুষের পৃথিবী করে সৃষ্টি করে তুলছে। যেখানে মানুষের পক্ষে যা-কিছু বাধা আছে তা দূর করবার জন্যে সে যে-শক্তি প্রয়োগ করছে তাকে যদি আমরা সামনে মূর্তিমান করে দেখতে পেতুম তা হলে তার বিরাট রূপে অভিভূত হতে হত।

এইখানে য়ুরোপের প্রকাশ যেমন বড়ো, যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব করতে পারে, তেমনি তার এমন একটা দিক আছে যেখানে তার প্রকাশ আচ্ছন্ন। উপনিষদে আছে, যে-সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করেছেন—তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবা-বিশন্তি; তাঁরা সর্বগামী সত্যকে সকল দিকে থেকে লাভ করে যুক্তাত্মভাবে সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করেন। সত্য সর্বগামী বলেই মানুষকে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেয়। বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশপথ খুলে দিচ্ছে; কিন্তু আজ সেই য়ুরোপে এমন একটি সত্যের অভাব ঘটেছে যাতে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে। অন্তরের দিকে য়ুরোপ মানুষের পক্ষে একটা বিশ্বব্যাপী বিপদ হয়ে উঠল। এইখানে বিপদ তার নিজেরও।

এই জাহাজেই একজন ফরাসি লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি আমাকে বলছিলেন, যুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপের নবীন যুবকদের মধ্যে বড়ো করে একটা ভাবনা ঢুকেছে। এই কথা তারা বুঝেছে, তাদের আইডিয়ালে একটা ছিদ্র দেখা দিয়েছিল যে-ছিদ্র দিয়ে বিনাশ ঢুকতে পারলে। অর্থাৎ কোথাও তারা সত্যভ্রষ্ট হল এতদিনে সেটা ধরা পড়েছে।

মানুষের জগৎ অমরাবতী, তার যা সত্য-ঐশ্বর্য তা দেশে কালে পরিমিত নয়। নিজের জন্য নিয়ত মানুষ এই-যে অমরলোক সৃষ্টি করছে তার মূলে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার অসীম সাহস। কিন্তু, বড়োকে গড়বার উপকরণ মানুষের ছোটো যেই চুরি করতে শুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়। মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সংকীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত করতে থাকে তখনই কূল ভাঙে, তখনই বিনাশের বন্যা দুর্দাম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র-নিজের জন্যে হলে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেছেন; এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। সে-কর্ম দুর্বল হবে না, সে-কর্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে-কর্মের ফলকামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।

বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের,সকল মানুষের–এইজন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকলরকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়ছে; মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু, এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এইজন্যেই মরবে–সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানে নি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায় নি। বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েছে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল। গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ংকর মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপের বাইরে সর্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ আজ এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেছে আপন কামনা নিয়ে। তাই এশিয়ার হৃদয়ের মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্ধায়, শক্তির গর্বে, অর্থের লোভে, পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই-যে চর্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপ করছে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফলল তখন আজ সে উদ্‌বিগ্ন। তৃণে আগুন লাগাচ্ছিল, আজ তার নিজের বনস্পতিতে সেই আগুন লাগল। সে ভাবছে, থামব কোথায়।

সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে। আমি তা বলি নে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।

জাভায় যাত্রাকালে এই-সমস্ত তর্ক আমার মাথায় কেন এল জিজ্ঞাসা করতে পার। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করে নি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্‌বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে; তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে-মন্ত্র মানুষকে রিক্ত ক'রে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানবচিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ সে-মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।

[শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত। ১ শ্রাবণ, ১৩৩৪]

২

কল্যাণীয়াসু

দেশ থেকে বেরবার মুখে আমার উপর ফরমাশ এল কিছু-কিছু লেখা পাঠাতে হবে। কাকে পাঠাব লেখা, কে পড়বে। সর্বসাধারণ? সর্বসাধারণকে বিশেষ করে চিনি নে, এইজন্যে তার ফরমাশে যখন লিখি তখন শক্ত করে বাঁধানো খুব একটা সাধারণ খাতা খুলে লিখতে হয়; সে-লেখার দাম খতিয়ে হিসেব কষা চলে।

কিন্তু, মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে; তার আলগা পাতা, সেটা যা-তা লেখবার জন্যে, সে লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তার লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ। সেরকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে; আটপৌরে লেখা–তার না আছে মাথায় পাগড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের কাছে পরের বা নিজের কোনো দরকার নিয়ে সে যায় না–সে যায় যেখানে বিনা-দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই, যেখানে কেবলমাত্র বকে যাওয়ার জন্যেই যাওয়া-আসা।

স্রোতের জলের যে-ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চলে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বকে যাওয়া।

এই বকে-যাওয়াটা মনের জীবনের লীলা। দেহটা কেবলমাত্র চলবার জন্যেই বিনা-প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এক-একবার ধাঁ করে চলে ফিরে আসে। বাজার করবার জন্যেও নয়, সভা করবার জন্যেও নয়, নিজের চলাতেই সে নিজে আনন্দ পায় বলে। তেমনি নিজের বকুনিতেই মন জীবনধর্মের তৃপ্তি পায়। তাই বকবার অবকাশ চাই, লোক চাই, বক্তৃতার জন্যে লোক চাই অনেক, বকার জন্যে এক- আধজন।

দেশে অভ্যস্ত জায়গায় থাকি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে, জানা অজানা লোকের ভিড়ে। নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ করবার সময় থাকে না। সেখানে নানা লোকের সঙ্গে নানা কেজো কথা নিয়ে কারবার। সেটা কেমনতরো। যেন বাঁধা পুকুরের ঘাটে দশজনে জটলা করে জল ব্যবহার। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা চাতকের ধর্ম আছে; হাওয়ায় উড়ে-আসা মেঘের বর্ষণের জন্যে সে চেয়ে থাকে একা একা। মনের আকাশে উড়ো ভাবনাগুলো সেই মেঘ-সেটা খামখেয়ালের ঝাপটা লেগে; তার আবির্ভাব তিরোভাব সবই আকস্মিক। প্রয়োজনের তাগিদমতো তাকে বাঁধা-নিয়মে পাওয়া যায় না বলেই তার বিশেষ দাম; পৃথিবী আপনারই বাঁধা জলকে আকাশে উড়ো জল করে দেয়; নিজের ফসলখেতকে সরস করবার জন্যে সেই জলের দরকার। বিনা-প্রয়োজনে নিজের মনকে কথা বলাবার সেই প্রয়োজন, সেটাতে মন আপন ধারাতেই আপনাকে অভিষিক্ত করে।

জীবনযাত্রার পরিচিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মন আজ যা-তা ভাববার সময় পেল। তাই ভেবেছি, কোনো সম্পাদকি বৈঠক স্মরণ করে প্রবন্ধ আওড়াব না, চিঠি লিখব তোমাকে। অর্থাৎ, পাত পেড়ে ভোজ দেওয়া তাকে বলা চলবে না; সে হবে গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় পড়ে-যাওয়া ফল আঁচলে ভরে দেওয়া। তার কিছু পাকা, কিছু কাঁচা; তার কোনোটাতে রঙ ধরেছে, কোনোটাতে ধরে নি। তার কিছু রাখলেও চলে, কিছু ফেলে দিলেও নালিশ চলবে না।

সেই ভাবেই চিঠি লিখতে শুরু করেছিলুম। কিন্তু, আকাশের আলো দিলে মুখ-ঢাকা। বৈঠকখানার আসর বন্ধ হয়ে গেলে ফরাশ বাতি নিবিয়ে দিয়ে যেমন ঝাড়লণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়, দ্যুলোকের ফরাশ সেই কাণ্ডটা করলে, একটা ফিকে ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশসভার তৈজসপত্র দিলে মুড়ে। এই অবস্থায় আমার মন তার হালকা কলমের খেলা আপনিই বন্ধ করে দেয়। বকুনির কূলহারা ঝরনা বাক্যের নদী হয়ে কখন একসময় গভীর খাদে চলতে আরম্ভ করে; তখন তার চলাটা কেবলমাত্র সূর্যের আলোয় কলধ্বনির নূপুর বাজানোর জন্যে নয়, একটা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছবার

সাধনায়। আনমনা সাহিত্য তখন লোকালয়ের মাঝখানে এসে প'ড়ে সমনস্ক হয়ে ওঠে। তখন বাণীকে অনেক বেশি অতিক্রম করে ভাবনাগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়।

উপনিষদে আছে: স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা; তিনি ভালোবাসেন, তিনি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই বিধান- করেন। সৃষ্টি-করাটা সহজ আনন্দের খেয়ালে, বিধান করায় চিন্তা আছে। যাকে খাস সাহিত্য বলে সেটা হল সেই সৃষ্টিকর্তার এলেকায়, সেটা কেবল আপন মনে। যদি কোনো হিসাবি লোক স্রষ্টাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে “কেন সৃষ্টি করা হল” তিনি জবাব দেন, “আমার খুশি!” সেই খুশিটাই নানা রঙে নানা রসে আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। পদ্মফুলকে যদি জিজ্ঞাসা করো “তুমি কেন হলে” সে বলে, “আমি হবার জন্যেই হলুম।” খাঁটি সাহিত্যেরও সেই একটিমাত্র জবাব।

অর্থাৎ , সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে, তিনি আমাকে চিঠি লিখছেন। আমার কোনো চিঠির জবাবে নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলে; কাউকে তো বলা চাই। অনেকেই মন দিয়ে শোনে না, অনেকে বলে, “এ তো সারবান নয়; এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো সম্পত্তির দলিল নয়।” সারবান থাকে মাটির গর্ভে, সোনার খনিতে; সে নেই ফুলের বাগানে, নেই সে উদয়দিগন্তে মেঘের মেলায়। আমি একটা গর্ব করে থাকি, ওই চিঠিলিখিয়ের চিঠি পড়তে পারৎপক্ষে কখনো ভুলি নে। বিশ্ববকুনি যখন-তখন আমি শুনে থাকি। তাতে বিষয়কাজের ক্ষতি হয়েছে, আর যারা আমাকে দলে ভিড়িয়ে কাজে লাগাতে চায় তাদের কাছ থেকে নিন্দাও শুনেছি; কিন্তু আমার এই দশা।

অথচ, মুশকিল হয়েছে এই যে, বিধাতাও আমাকে ছাড়েন নি। সৃষ্টিকর্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত যে-রাস্তাটা গেছে সে-রাস্তায় দুই প্রান্তেই আমার আনাগোনার কামাই নেই।

এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি। যিনি সৃষ্টিকর্তা স এব বিধাতা; সেইজন্যেই তাঁর সৃষ্টি ও বিধান এক হয়ে মিশেছে, তাঁর লীলা ও কাজ এই দুয়ের মধ্যে একান্ত বিভাগ পাওয়া যায় না। তাঁর সকল কর্মই কারুকর্ম; ছুটিতে খাটুনিতে গড়া; কর্মের রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্যের আব্রু টেনে দিতে তাঁর আলস্য নেই। কর্মকে তিনি লজ্জা দেন নি। দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থাকৌশল আছে কিন্তু তাকে আবৃত করে আছে তার সুষমাসৌষ্ঠব, বস্তুত সেইটেই প্রকাশমান।

মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করবার অধিকার দিয়েছেন; এইটেই তার সব চেয়ে বড়ো অধিকার। মানুষ যেখানেই আপনার কর্মের গৌরব বোধ করেছে সেখানেই কর্মকে সুন্দর করবার চেষ্টা করেছে। তার ঘরকে বানাতে চায় সুন্দর করে; তার পানপাত্র অন্নপাত্র সুন্দর; তার কাপড়ে থাকে শোভার চেষ্টা। তার জীবনে প্রয়োজনের চেয়ে সজ্জার অংশ কম থাকে না। যেখানে মানুষের মধ্যে স্বভাবের সামঞ্জস্য আছে সেখানে এইরকমই ঘটে।

এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, যেখানে কোনো একটা রিপু, বিশেষত লোভ, অতি প্রবল হয়ে ওঠে। লোভ জিনিসটা মানুষের দৈন্য থেকে, তার লজ্জা নেই; সে আপন অসম্ভ্রমকে নিয়েই বড়াই করে। বড়ো বড়ো মুনফাওয়ালা পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন করে ফেলেছে দম্ভভরেই। মানুষের রুচিকে সে একেবারেই স্বীকার করে নি; একমাত্র স্বীকার করেছে তার পাওনার ফুলে-ওঠা থলিটাকে।

বর্তমান যুগের বাহ্যরূপ তাই নির্লজ্জতায় ভরা। ঠিক যেন পাকযন্ত্রটা দেহের পর্দা থেকে সর্বসম্মুখে বেরিয়ে এসে আপন জটিল অন্ত্রতন্ত্র নিয়ে সর্বদা দোলায়মান। তার ক্ষুধার দাবি ও সুনিপুণ পাকপ্রণালীর বড়াইটাই সর্বাঙ্গীণ দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। দেহ যখন আপন স্বরূপকে প্রকাশ করতে চায় তখন সুসংযত সুষমার দ্বারাই করে; যখন সে আপন ক্ষুধাকেই সব ছাড়িয়ে একান্ত করে তোলে তখন বীভৎস হতে তার কিছুমাত্র লজ্জা নেই। লালায়িত রিপুর নির্লজ্জতাই বর্বরতার প্রধান লক্ষণ, তা সে সভ্যতার

গিলটি-করা তকমাই পরুক কিম্বা অসভ্যতার পশুচর্মেই সেজে বেড়াক-ডেভিল্ ডান্সই নাচুক কিম্বা জাজ্ ডান্স্।

বর্তমান সভ্যতায় রুচির সঙ্গে কৌশলের যে বিচ্ছেদ চারদিক থেকেই দেখতে পাই তার একমাত্র কারণ, লোভটাই তার অন্য-সকল সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হয়ে উঠেছে। বস্তুর সংখ্যাধিক্যবিস্তারের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সুন্দরকে সে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধ মানবধর্মের মধ্যে যে-আত্মবিপ্লব ঘটে তাতে দাসেরই যদি জয় হয়, পেটুকতারই যদি আধিপত্য বাড়ে, তা হলে যম আপন সশস্ত্র দূত পাঠাতে দেরি করবে না; দলবল নিয়ে নেমে আসবে দ্বেষ হিংসা মোহ মদ মাৎসর্য, লক্ষ্মীকে দেবে বিদায় করে।

পূর্বেই বলেছি, দীনতা থেকে লোভের জন্ম; সেই লোভের একটি স্থূলতনু সহোদরা আছে তার নাম জড়তা। লোভের মধ্যে অসংযত উদ্যম; সেই উদ্যমেই তাকে অশোভন করে। জড়তায় তার উলটো, সে নড়ে বসতে পারে না; সে না পারে সজ্জাকে গড়তে, না পারে আবর্জনাকে দূর করতে; তার অশোভনতা নিরুদ্যমের। সেই জড়তার অশোভনতায় আমাদের দেশের মানসম্ভ্রম নষ্ট করেছে। তাই আমাদের ব্যবহারে আমাদের জীবনের অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য বিদায় নিতে বসল; আমাদের ঘরে-দ্বারে বেশে-ভূষায় ব্যবহারসামগ্রীতে রুচির স্বাধীন প্রকাশ রইল না; তার জায়গায় এসে পড়েছে চিত্তহীন আড়ম্বর-এতদূর পর্যন্ত শক্তির অসাড়তা এবং আপন রুচি সম্বন্ধেও নির্লজ্জ আত্ম-অবিশ্বাস যে, আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি দোকানগুলো।

বারবার মনে করি, লেখাগুলোকে করব বঙ্কিমবাবু যাকে বলেছেন "সাধের তরণী।' কিন্তু, কোথা থেকে বোঝা এসে জমে, দেখতে দেখতে সাধের তরী হয়ে ওঠে বোঝাই-তরী। ভিতরে রয়েছে নানাপ্রকারের ক্ষোভ, লেখনীর আওয়াজ শুনেই তারা স্থানে অস্থানে বেরিয়ে পড়ে; কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ যার মালেক নয় এমন একটা রচনা পেলেই সেটাকে অম্নিবাস গাড়ি করে তোলে। কেউ-বা ভিতরেই ঢুকে বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে যায়,

কেউ-বা পায়দানে চড়ে চলতে থাকে; তার পরে যেখানে-খুশি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।

আজ শ্রাবণমাসের পয়লা। কিন্তু ঝাঁকড়া-ঝুঁটিওয়ালা শ্রাবণ এক ভবঘুরে বেদের মতো তার কালো মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে কোথায় যে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই। আজ যেন আকাশসরস্বতী নীলপদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে। আমার মন ওই সঙ্গে সঙ্গে দুলছে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘিরে। আমি যেন আলোতে তৈরি, বাণীতে গড়া, বিশ্বরাগিণীতে ঝংকৃত, জলে স্থলে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া। আমি শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রটা কোন্ কাল থেকে কেবলই ভেরী বাজাচ্ছে, আর পৃথিবীতে তারই উত্থানপতনের ছন্দে জীবের ইতিহাসযাত্রা চলেছে আবির্ভাবের অস্পষ্টতা থেকে তিরোভাবের অদৃশ্যের মধ্যে। একদল বিপুলকায় বিকটাকার প্রাণী যেন সৃষ্টিকর্তার দুঃস্বপ্নের মতো দলে দলে এল, আবার মিলিয়ে গেল। তার পরে মানুষের ইতিহাস কবে শুরু হল প্রদোষের ক্ষীণ আলোতে, গুহাগহ্বর-অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়। দুই পায়ের উপর খাড়া-দাঁড়ানো ছোটো ছোটো চটুল জীব, লাফ দিয়ে চড়ে চড়ে বসল মহাকায় বিপদবিভীষিকার পিঠের উপর, বিষ্ণু যেমন চড়েছেন গরুড়ের পিঠে। অসাধ্যের সাধনায় চলল তারা জীর্ণ যুগান্তরের ভগ্নাংশবিকীর্ণ দুর্গম পথে। তারই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে ঘিরে ঘিরে বরুণের মৃদঙ্গ বাজতে লাগল দিনে রাত্রে, তরঙ্গে তরঙ্গে। আজ তাই শুনছি আর এমন-কোনো একটা কথা ছন্দে আবৃত্তি করতে ইচ্ছা করছে যা অনাদিকালের। আজকের দিনের মতোই এইরকম আলো-ঝল্‌মলানো কলকল্লোলিত নীলজলের দিকে তাকিয়ে ইংরেজ কবি শেলি একটি কবিতা লিখেছেন–

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright.

কিন্তু, এ তাঁর ক্লান্ত জীবনের অবসাদের বিলাপ। এর সঙ্গে আজ ভিতরে বাইরে মিল পাচ্ছি নে। একটা জগৎজোড়া কলক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বটে, সেই ক্রন্দন ভরিয়ে তুলছে অন্তরীক্ষকে, যে-অন্তরীক্ষের উপর বিশ্বরচনার ভূমিকা, যে-অন্তরীক্ষকে বৈদিক ভারত

নাম দিয়েছে ক্রন্দসী। এ কিন্তু শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়। এ নবজাত শিশুর ক্রন্দন, যে-শিশু ঊর্ধ্বস্বরে বিশ্বদ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে তার প্রথমক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, "অয়মহং ভোঃ।" অসীম ভাবীকালের দ্বারে সে অতিথি। অস্তিত্বের ঘোষণায় একটা বিপুল কান্না আছে। কেননা, বারে বারে তাকে ছিন্ন করতে হয় আবরণ, চূর্ণ করতে হয় বাধা। অস্তিত্বের অধিকার পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, প্রতি মুহূর্তেই সেটা লড়াই-করে-নেওয়া জিনিস। তাই তার কান্না এত তীব্র, আর জীবলোকে সকলের চেয়ে তীব্র মানবসত্তার নবজীবনের কান্না। সে যেন অন্ধকারের গর্ভ বিদারণ-করা নবজাত আলোকের ক্রন্দনধ্বনি। তারই সঙ্গে সঙ্গে নব নব জন্মে নব নব যুগে দেবলোকে বাজে মঙ্গলশঙ্খ, উচ্চারিত হয় বিশ্বপিতামহের অভিনন্দনমন্ত্র।

আজকের দিনে এই আমার শেষ উপলব্ধি নয়। সকালে দেখলুম, সমুদ্রের প্রান্তরেখায় আকাশ তার জ্যোর্তিময়ী চিরন্তনী বাণীটি লিখে দিলে; সেটি পরম শান্তির বাণী, তা মর্ত্যলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্তকোলাহলের আবর্তকে ছাড়িয়ে ওঠে, যেন অশ্রুর ঢেউয়ের উপরে শ্বেতপদ্মের মতো। তার পরে দিনশেষের দিকে দেখলুম একটি অখ্যাত ব্যক্তিকে, যার মধ্যে মনুষ্যত্ব অপমানিত–যদি সময় পাই তার কথা পরে বলব। তখন মানব-ইতিহাসের দিগন্তে দিগন্তে দেখতে পেলুম বিরোধের কালো মেঘ, অশান্তির প্রচ্ছন্ন বজ্রগর্জন, আর লোকালয়ের উপর রুদ্রের ভ্রূকুটিচ্ছায়া। ইতি

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত। ২ শ্রাবণ, ১৩৩৪]

৩

বুনো হাতি মূর্তিমান উৎপাত, বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো। এতটুকু মানুষ, হাতির একটা পায়ের সঙ্গেও যার তুলনা হয় না, সে ওকে দেখে খামখা বলে উঠল, “আমি এর পিঠে চড়ে বেড়াব।” এই প্রকাণ্ড দুর্দাম প্রাণপিণ্ডটাকে গাঁ গাঁ করে শুঁড় তুলে আসতে দেখেও এমন অসম্ভবপ্রায় কথা কোনো একজন ক্ষীণকায় মানুষ কোনো এককালে ভাবতেও পেরেছে, এইটেই আশ্চর্য। তার পরে “পিঠে চড়ব” বলা থেকে আরম্ভ করে পিঠে চড়ে-বসা পর্যন্ত যে-ইতিহাস সেটাও অতি অদ্ভূত। অনেকদিন পর্যন্তই সেই অসম্ভবের চেহারা সম্ভবের কাছ দিয়েও আসে নি–পরম্পরাক্রমে কত বিফলতা কত অপঘাত মানুষের সংকল্পকে বিদ্রূপ করেছে তার সংখ্যা নেই; সেটা গণনা করে করে মানুষ বলতে পারত, এটা হবার নয়। কিন্তু তা বলে নি। অবশেষে একদিন সে হাতির মতো জন্তুরও পিঠে চড়ে ফসলখেতের ধারে লোকালয়ের রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়ালো। এটা সাংঘাতিক অধ্যবসায়, সেইজন্যেই গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্তি। এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, এক দিকে রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন; আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেই হল যান–সিদ্ধির যানবাহনযোগে মানুষ কেবলই এগিয়ে চলছে। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইঁদুর, আর তার য়েরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি। ইঁদুরটা চুপিচুপি সন্ধান বাতলিয়ে দেয়, কিন্তু ওই হাতিটাকে কায়দা করে নিতে মানুষের অনেক দুঃখ। তা হোক, মানুষ দুঃখকে দেখে হার মানে না, তাই সে আজ দ্যুলোকের রাস্তায় যাত্রা আরম্ভ করলে। কালিদাস রাঘবদের কথায় বলেছেন, তাঁরা “আনাকরথবর্ত্মনাম্’–স্বর্গ পর্যন্ত তাঁদের রথের রাস্তা। যখন এ কথা কবি বলেছেন তখন মাটির মানুষের মাথায় এই অদ্ভুত চিন্তা ছিল যে, আকাশে না চললে মানুষের সার্থকতা নেই। সেই চিন্তা ক্রমে আজ রূপ ধরে বাইরের আকশে পাখা ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু, রূপ যে ধরল সে মৃত্যুজয়কারী ভীষণ তপস্যায়। মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সন্ধান

করতে জানে, এই যথেষ্ট নয়; মানুষের কীর্তিবুদ্ধি সাহস করতে জানে, এইটে তার সঙ্গে যখন মিলেছে তখনই সাধকদের তপঃসিদ্ধির পথে পথে ইন্দ্রদেব যে-সব বাধা রেখে দেন সেগুলো ধূলিসাৎ হয়।

তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখলে সমুদ্র। এত বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না। চোখে দেখতে পায় না এর পার, তলিয়ে পায় না এর তল। যমের মোষের মতো কালো, দিগন্তপ্রসারিত বিরাট একটা নিষেধ কেবলই তরঙ্গতর্জনী তুলছে। চিরবিদ্রোহী মানুষ বললে, “নিষেধ মানব না।” বজ্রগর্জনে জবাব এল, “না মান তো মরবে।” মানুষ তার এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বললে, “মরি তো মরব!” এই হল জাত-বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা। জাত-বিদ্রোহীরাই চিরদিন জিতে এসেছে। একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ নানা ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলে। আজ পর্যন্ত তাই চলছে। মানুষদের মধ্যে যারা যত খাঁটি বিদ্রোহী, যারা বাহ্য শাসনের সীমাগণ্ডি যতই মানতে চায় না, তাদের অধিকার ততই বেড়ে চলতে থাকে।

যেদিন সাড়ে তিনহাত মানুষ স্পর্ধা করে বললে, “এই সমুদ্রের পিঠে চড়ব” সেদিন দেবতারা হাসলেন না; তাঁরা এই বিদ্রোহীর কানে জয়মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে রইলনে। সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হয়েছে, সমুদ্রের তলটাকেও কায়দা করা শুরু হল। সাধনার পথে ভয় বারবার ব্যঙ্গ করে উঠছে; বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তরসাধক অবিচলিত ব'সে প্রহরে প্রহরে হাঁক দিচ্ছে, “মা ভৈঃ।”

কালকের চিঠিতে ক্রন্দসীর কথা বলেছি, অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সত্তার ক্রন্দন গ্রহে নক্ষত্রে। এই সত্তা বিদ্রোহী, অসীম অব্যক্তের সঙ্গে তার নিরন্তর লড়াই। বিরাট অপ্রকাশের তুলনায় সে অতি সামান্য, কিন্তু অন্ধকারের অন্তহীন পারাবারের উপর দিয়ে ছোটো ছোটো কোটি কোটি আলোর তরী সে ভাসিয়ে দিয়েছে-দেশকালের বুক চিরে অতলস্পর্শের উপর দিয়ে তার অভিযান। কিছু ডুবছে, কিছু ভাসছে, তবু যাত্রার শেষ নেই।

প্রাণ তার বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে পৃথিবীতে অতি দুর্বলরূপে একদিন দেখা দিয়েছিল। অতি প্রকাণ্ড, অতি কঠিন, অতি গুরুভার অপ্রাণ চারিদিকে গদা উদ্যত করে দাঁড়িয়ে, আপন ধুলোর কয়েদখানায় তাকে দ্বার জানলা বন্ধ করে প্রচণ্ড শাসনে রাখতে চায়। কিন্তু, বিদ্রোহী প্রাণ কিছুতেই দমে না; দেয়ালে দেয়ালে কত জায়গায় কত ফুটোই করছে তার সংখ্যা নেই, কেবলই আলোর পথ নানা দিক দিয়েই খুলে দিচ্ছে।

সত্তার এই বিদ্রোহমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েছে এমন আর-কোনো জীব না। মানুষের মধ্যে যার বিদ্রোহশক্তি যত প্রবল,যত দুর্দমনীয়, ইতিহাসকে ততই সে যুগ হতে যুগান্তরে অধিকার করছে, শুধু সত্তার ব্যাপ্তি দ্বারা নয়, সত্তার ঐশ্বর্য দ্বারা।

এই বিদ্রোহের সাধনা দুঃখের সাধনা; দুঃখই হচ্ছে হাতি, দুঃখই হচ্ছে সমুদ্র। বীর্যের দর্পে এর পিঠে যারা চড়ল তারাই বাঁচল; ভয়ে অভিভূত হয়ে এর তলায় যারা পড়েছে তারা মরেছে। আর, যারা একে এড়িয়ে সস্তায় ফল লাভ করতে চায় তারা নকল ফলের ছদ্মবেশে ফাঁকির বোঝার ভারে মাথা হেঁট করে বেড়ায়। আমাদের ঘরের কাছে সেই জাতের মানুষ অনেক দেখা যায়। বীরত্বের হাঁকডাক করতে তারা শিখেছে, কিন্তু সেটা যথাসম্ভব নিরাপদে করতে চায়। যখন মার আসে তখন নালিশ করে বলে, বড়ো লাগছে। এরা পৌরুষের পরীক্ষাশালায় বসে বিলিতি বই থেকে তার বুলি চুরি করে, কিন্তু কাগজের পরীক্ষা থেকে যখন হাতের পরীক্ষার সময় আসে তখন প্রতিপক্ষের অনৌদার্য নিয়ে মামলা তুলে বলে, “ওদের স্বভাব ভালো নয়, ওরা বাধা দেয়।”

মানুষকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সম্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন ঃ দৃষ্টাদ্ভুতংরূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্-মানুষ যখন প্রাণমন দিয়ে স্তব করতে পেরেছে:

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং

সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ;

তুমিই অনন্তবীর্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত। ইতি

[শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৪]

৪

কাল সকালেই পৌঁছব সিঙ্গাপুরে। তার পর থেকে আমার ডাঙার পালা। এই-যে চলছে আমার মনে মনে বকুনি, এটাতে খুবই বাধা হবে। অবকাশের অভাব হবে বলে নয়, মন এই কদিন যে-কক্ষে চলছিল সে-কক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হবে বলে। কিসের জন্যে। সর্বসাধারণ বলে যে একটি মনুষ্যসমষ্টি আছে তারই আকর্ষণে।

লেখবার সময় তার কোনো আকর্ষণ- যে একটুও মনের মধ্যে থাকবে না, তা হতেই পারে না। কিন্তু, তার নিকটের আকর্ষণটা লেখার পক্ষে বড়ো ব্যাঘাত। কাছে যখন সে থাকে তখন সে কেবলই ঠেলা দিয়ে দিয়ে দাবি করতে থাকে। দাবি করে তারই নিজের মনের কথাটাকে। প্রকাণ্ড একটা বাইরের ফরমাশ কলমটাকে ভিতরে ভিতরে টান মারে। বলতে চাই বটে “তোমাকে গ্রাহ্য করি নে”, কিন্তু হেঁকে উঠে বলার মধ্যেই গ্রাহ্য করাটা প্রমাণ হয়।

আসল কথা, সাহিত্যের শ্রোতৃসভায় আজ সর্বসাধারণই রাজাসনে। এ সত্যটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসা অসম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে উড়িয়ে দেবেই বা কেন। এমন সময় কবে ছিল যখন সাহিত্য সমস্ত মানবসাধারণের জন্যেই ছিল না।

কথাটা একটু ভেবে-দেখবার। কালিদাসের মেঘদূত মানবসাধারণের জন্যেই লেখা, আজ তার প্রমাণ হয়ে গেছে। যদি কোনো বিশিষ্ট দলের জন্যে লেখা হত তা হলে সে দলও থাকত না আর মেঘদূতও যেত তারই সঙ্গে অনুমরণে। কিন্তু, এখন যাকে পাবলিক বলছি কালিদাসের সময় সেই পাবলিক অত্যন্ত গা-ঘেঁষা হয়ে শ্রোতারূপে ছিল না। যদি থাকত তা হলে যে-মানবসাধারণ শত শত বৎসরের মহাক্ষেত্রে সমাগত তাদের পথ তারা অনেকটা পরিমাণে আটকে দিত।

এখনকার পাবলিক একটা বিশেষ কালের দানাবাঁধা সর্বসাধারণ। তার মধ্যে খুব নিরেট হয়ে তাল-পাকিয়ে আছে এখনকার কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, এখনকার কালের বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি এবং আরো কত কী। এই সর্বসাধারণ যে মানবসাধারণের প্রতিরূপ, তা বলা চলবে না। এর ফরমাশ যে একশো বছর পরের ফরমাশের সঙ্গে মিলবে না, সে- কথা জোর করেই বলতে পারি। কিন্তু, এই উপস্থিত-কালের সর্বসাধারণ কানের খুব কাছে এসে জোর গলায় দুও দিচ্ছে, বাহবা দিচ্ছে।

উপস্থিতকালের সংকীর্ণ পরিধির তুলনাতেও এই দুও-বাহবার স্থায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। পাবলিক-মহারাজ আজ দুই চোখ লাল করে যে-কথাটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আসছে-কাল সেইটেকেই এমনি চড়া গলায় ব্যবহার করে যেন সেটা তার নিজেরই চিরকালের চিন্তিত কথা। আজ যে- কথা শুনে তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল বয়ে গেল, আসছে-কাল সেটাকে নিয়ে হাসাহাসি করবার সময় নিজের গদ্‌গদচিত্তের পূর্ব ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়।

ইংরেজ বেনের আপিসঘর-গুদামঘরের আশে-পাশে হঠাৎ যখন কলকাতা শহরটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল তখন সেখানে এই নতুন-গড়া দোকানপাড়ার এক পাবলিক দেখা দিলে। অন্তত, তার এক ভাগের চেহারা হুতুম পেঁচার নকশায় উঠেছে। তারই ফরমাশের ছাপ পড়েছে দাশুরায়ের পাঁচালিতে। ঘন ঘন অনুপ্রাস তপ্ত-খোলার উপরকার খইয়ের মতো পট্‌পট্‌ শব্দে ফুটে ফুটে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল–

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

চারিদিকে হায়-হায় শব্দে সভা তোলপাড়। দুই কানে হাত-চাপা, তারস্বরে দ্রুত লয়ে গান উঠল–

ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ,
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।
অতি নগণ্য কাজে, অতি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য-মাঝে কত কাঁদিলাম। ইত্যাদি।

দোকানপাড়ার জনসাধারণ খুশি হয়ে নগদ বিদায় করলে। অবকাশের সম্পদকে অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি যার ছিল না সেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাটের পাব্লিকের মাথা-গুনতির জোরে মানবসাধারণের প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে নাকি। বস্তুত, এই জনসাধারণই দাশুরায়ের প্রতিভাকে বিশ্বসাধারণের মহাসভায় উত্তীর্ণ হতে বাধা দিয়েছিল।

অথচ, মৈমনসিং থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। কোনো শহুরে পাব্লিকের দ্রুত ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি-বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে, তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই, এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল–তা ধানের মঞ্জরী।

যে-কবিকে আমরা কবি বলে সম্মান করে থাকি তার প্রতি সম্মানের মধ্যে এই সাধুবাদটুকু থাকে যে, তার একলার কথাই আমাদের সকলের কথা। এইজন্যেই কবিকে একলা বলতে দিলেই সে সকলের কথা সহজে বলতে পারে। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেইদিনকার হাটের লোকের মনের কথা যেমন-তেমন করে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সেইদিনকার বহু-মুণ্ডের মাথা-নাড়া-গুনতির জোরে আমরা যেন আপন রচনাকে কৃতার্থ মনে না করি, যেন আমাদের এই কথা মনে করবার সাহস থাকে যে, সাহিত্যের গণনাতত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে থাকে।

এইবার আমার জাহাজের চিঠি তার অন্তিম পংক্তির দিকে হেলে পড়ল। বিদায় নেবার পূর্বে তোমার কাছে মাপ চাওয়া দরকার মনে করছি। তার কারণ, চিঠি লিখব বলে বসলুম কিন্তু কোনোমতেই চিঠি লেখা হয়ে উঠল না। এর থেকে আশঙ্কা হচ্ছে, আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতি দিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চলতে চলতে চারদিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজে হয় না। অথচ, এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেছি। সেই চিঠিগুলি ছিল চলতি কালের সিনেমা ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলোছায়ার দিকে মেলে দেওয়া। সেই-সব ছাপের ধারায় চলত চিঠি। এখন বুঝিবা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশি।

মানুষ তো কোনো-একটা জায়গায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এইজন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তার যথার্থ চিত্র হতেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপন লোক, নিয়ত তারা সেই পরিচয়টা পেতে ইচ্ছা করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার উপরে প্রকাশিত আত্মীয়-লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যেই।

কিন্তু, সকলপ্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে-ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন

একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত, এ কথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে–দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম; বর্ণনাসাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপিবাচস্পতি কিম্বা লিপিসার্বভৌম কিম্বা লিপিচক্রবর্তী। ইতি

[শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৪। নাগপঞ্চমী]

৫

সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তটসীমা। অনেক দূর পর্যন্ত জল অগভীর, জলের রঙে মাটির আভাস, সে যেন ধরণীর গেরুয়া আঁচল এলিয়ে পড়েছে। ঢেউ নেই, সমস্তদিন জলরাশি এগোয় আর পিছোয় অতি ধীর গমনে। অপ্সরী আসছে চুপি চুপি পিছন থেকে পৃথিবীর চোখ টিপে ধরবে বলে–সোনার রেখায় রেখায় কৌতুকের মুচকে-হাসি।

সামনে বাঁ-দিকে একদল নারকেলগাছ, সুদীর্ঘ গুঁড়ির উপর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি। নিত্যদোলায়িত শাখায় শাখায় সূর্যের আলো ওরা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে, চঞ্চল ছেলেরা যেমন নদীর ঘাটে জল-ছোঁড়াছুঁড়ি করে। সকালের আকাশে ওদের এই অবগাহনস্নান।

এটা একজন চিনীয় ধনীর বাড়ি। আমরা তাঁর অতিথি। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের কেদারায় বসে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে বুক ভরে বইছে পশ্চিমে হাওয়া। চেয়ে দেখছি, আকাশের কোণে কোণে দলভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দি ছেড়ে ফেলেছে, এখন কিছুদিনের জন্যে সূর্যের আলোর সঙ্গে ওদের সন্ধি। আমার অস্পষ্ট ভাবনাগুলোর উপর ঝরে পড়ছে কম্পমান নারকেলপাতার ঝরঝর শব্দের বৃষ্টি, বালির উপর দিয়ে ভাঁটার সমুদ্রের পিছু-হটার শব্দ ওরই সঙ্গে একই মৃদুস্বরে মেলানো। ওদিকে পাশের ঘরে ধীরেন এসরাজ নিয়ে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে–ভৈরোঁ থেকে রামকেলি, রামকেলি থেকে ভৈরবী; আস্তে আস্তে অকেজো মেঘের মতো খেয়ালের হাওয়ায় বদল হচ্ছে রাগিণীর আকৃতি।

আজ সকালে মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র, তীরের দিকে টানছে তাকে কোন্ দিকে তার ঠিকানা নেই। আপনাকে আপন সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ভরপুর মেলে দিয়ে বসে আছি, নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট রোদ-পোয়ানো ওই ছোটো দ্বীপটির মতো।

আমার মধ্যে এই ঘনীভূত অনুভবটিকে বলা যেতে পারে হওয়ার আনন্দ। রূপে রঙে আলোয় ধ্বনিতে আকাশে অবকাশে ভরে-ওঠা একটি মূর্তিমান সমগ্রতা আমার চিত্তের উপরে ঘা দিয়ে বলছে "আছি"; তারই জগতে আমার চৈতন্য উছলে উঠছে; সমুদ্রকল্লোলেরই মতো একতান শব্দ জাগছে, ওম্, অর্থাৎ এই-যে আমি। বিরাট একটা "না", হাঁ-করা তার মুখগহ্বর, প্রকাণ্ড তার শূন্য–তারই সামনে ওই নারকেলগাছ দাঁড়িয়ে, পাতা নেড়ে নেড়ে বলছে, এই-যে আমি। দুঃসাহসিক সত্তার এই স্পর্ধা গভীর বিস্ময়ে বাজছে আমার মনে, আর ধীরেন ওই -যে ভৈরবীতে মীড় লাগিয়েছে সেও যেন বিশ্বসত্তার আত্মঘোষণা, আপন কম্পমান সুরের ধ্বজাটিকে অসীম শূন্যের মাঝখানে তুলে ধরেছে।

এই তো হল "হওয়া"। এইখানেই শেষ নেই। এর সঙ্গে আছে করা। সমুদ্র আছে অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ, কিন্তু তার উপরে উপরে উঠছে ঢেউ, চলছে জোয়ার ভাঁটা। জীবনে করার বিরাম নেই। এই করার দিকে কত প্রয়াস, কত উপকরণ, কত আবর্জনা। এরা সব জমে জমে কেবলই গণ্ডী হয়ে ওঠে, দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এরা বাহিরে সমগ্রতার ক্ষেত্রকে, অন্তরে পরিপূর্ণতার উপলব্ধিকে, টুকরো টুকরো করতে থাকে। অহমিকার উত্তেজনায় কর্ম উদ্ধত হয়ে, একান্ত হয়ে, আপনাকে সকলের আগে ঠেলে তোলে; হওয়ার চেয়ে করা বড়ো হয়ে উঠতে চায়। এতে ক্লান্তি, এতে অশান্তি, এতে মিথ্যা। বিশ্বকর্মার বাঁশিতে নিয়তই যে ছুটির সুর বাজে এই কারণেই সেটা শুনতে পাই নে; সেই ছুটির সুরেই বিশ্বকাজের ছন্দ বাঁধা।

সেই সুরটি আজ সকালের আলোতে ওই নারকেলগাছের তানপুরায় বাজছে। ওখানে দেখতে পাচ্ছি, শক্তির রূপ আর মুক্তির রূপ অনবচ্ছিন্ন এক। এতেই শান্তি, এতেই সৌন্দর্য। জীবনের মধ্যে এই মিলনটিই তো খুঁজি–করার চিরবহমান নদীধারায় আর

হওয়ার চিরগম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন। এই আত্মপরিতৃপ্ত মিলনটিকে লক্ষ্য করেই গীতা বলেছেন, “কর্ম করো, ফল চেয়ো না।” এই চাওয়ার রাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে তার অমৃত ঢেলে নেবার জন্যে লালায়িত। ভিতরকার সহজ হওয়াটি সার্থক হয় বাইরেকার সহজ কর্মে। অন্তরের সেই সার্থকতার চেয়ে বাইরের স্বার্থ প্রবল হয়ে উঠলেই কর্ম হয় বন্ধন; সেই বন্ধনেই জড়িত যত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা, নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা। এই কর্মের দুঃখ, কর্মের অগৌরব, যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন মানুষ বলে বসে “দুর হোক গে, কর্ম ছেড়ে দিয়ে চলে যাই।” তখন আবার আহ্বান আসে, কর্ম ছেড়ে দিয়ে কর্ম থেকে নিষ্কৃতি নেই; করাতেই হওয়ার আত্মপ্রকাশ। বাহ্য ফলের দ্বারা নয়, আপন অন্তর্নিহিত সত্যের দ্বারাই কর্ম সার্থক হোক, তাতেই হোক মুক্তি।

ফল-চাওয়া কর্মের নাম চাকরি, সেই চাকরির মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক। চাকরিতে মাইনের জন্যই কাজ, কাজের জন্যে কাজ নয়। কাজ তার নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে অপমান করে। মর্ত্যলোকে প্রয়োজন বলে জিনিসটাকে একেবারেই অস্বীকার করতে পারি নে। বেঁচে থাকবার জন্যে আহার করতেই হবে। বলতে পারব না, “নেই বা করলেম।” সেই আবশ্যকের তাড়াতেই পরের দ্বারে মানুষ উমেদারি করে, আর সেইসঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞানী ভাবতে থাকে কী করলে এই কর্মের জড় মারা যায়। বিদ্রোহী মানুষ বলে বসে, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। অর্থাৎ, এতই কম খাব, কম পরব, রৌদ্রবৃষ্টি এমন করে সহ্য করতে শিখব, দাসত্বে প্রবৃত্ত করবার জন্যে প্রকৃতি আমাদের জন্যে যতরকম কানমলার ব্যবস্থা করেছে সেগুলোকে এতটা এড়িয়ে চলব যে, কর্মের দায় অত্যন্ত হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু, প্রকৃতির কাজে শুধু কানমলার তাড়া নেই, সেইসঙ্গে রসের জোগান আছে। এক দিকে ক্ষুধায় দেয় দুঃখ, আর-এক দিকে রসনায় দেয় সুখ–প্রকৃতি একই সঙ্গে ভয় দেখিয়ে আর লোভ দেখিয়ে আমাদের কাজ করায়। সেই লোভের দিক থেকে আমাদের মনে জন্মায় ভোগের ইচ্ছা। বিদ্রোহী মানুষ বলে, ওই ভোগের ইচ্ছাটা প্রকৃতির চাতুরী, ওইটেই মোহ, ওটাকে তাড়াও, বলো, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্–মানব না দুঃখ, চাইব না সুখ।

দু-চারজন মানুষ এমনতরো স্পর্ধা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, কিন্তু সব মানুষই যদি এই পন্থা নেয় তা হলে বৈরাগ্য নিয়েই পরস্পর লড়াই বেধে যাবে–তখন বল্কলে কুলোবে না, গিরিগহ্বরে ঠেলাঠেলি ভিড় হবে, ফলমূল যাবে উজাড় হয়ে। তখন কপ্‌নিপরা ফৌজ মেশিন-গান বের করবে।

সাধারণ মানুষের সমস্যা এই যে, কর্ম করতেই হবে। জীবনধারণের গোড়াতেই প্রয়োজনের তাড়া আছেই। তবুও কী করলে কর্ম থেকে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হালকা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, কী করলে কর্মে পরের দাসত্বের চেয়ে নিজের কর্তৃত্বটা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কর্ম থেকে কর্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম ততই মজুরির বোঝা হয়ে মানুষকে চেপে মারবে; এই শূদ্রত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ থেকে পোস্টকার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চারদিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এঁটে গয়না গড়ছে। ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর। এই কাজের দ্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ করছে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ করছে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানের মূর্তি দিচ্ছে। মুখ্যত এ-কাজটি তার আপনারই, গৌণত যে-মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে করে ফলকামনাটা হয়ে গেল লঘু, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল, কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে। এককালে বণিককে সমাজ অবজ্ঞা করত, কেননা, বণিক কেবল বিক্রি করে, দান করে না। কিন্তু, এই স্যাকরা এই-যে গয়নাটি গড়লে তার মধ্যে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিলে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েছে, বাইরে থেকে জোগায় নি।

ভৃত্যকে রেখেছি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ একান্ত হলে সেটা হয় ষোলো- আনা দাসত্ব। যে-সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায়

মানুষের প্রতি দরদ হারায় নি সে-সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে করে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জেঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফলকামনাটা যায় যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি, গোয়ালা গোরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফলকামনাকে তুচ্ছ করে দিয়েছে তার ভালোবাসায়; কর্ম করেও কর্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ গোয়ালা শূদ্র নয়। যে-গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখেই গোরু পোষে, কষাইকে গোরু বেচতে যার বাধে না, সেই হল শূদ্র; কর্মে তার অগৌরব, কর্ম তার বন্ধন। যে-কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মের শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কেউ-বা শিক্ষক, কেউ-বা বিচারক, কেউ-বা শাসনকর্তা, কেউ-বা ধর্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষি আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়–আজকের এই রৌদ্রে-উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের নারকেলগাছের মর্মরে তাদের জীবনসংগীতের মূল সুরটি বাজছে।

[মলাক্কা ২৮শে জুলাই ১৯২৭]

৬

কল্যাণীয়াসু

এখনই দুশো মাইল দূরে এক জায়গায় যেতে হবে। সকলেই সাজসজ্জা করে জিনিসপত্র বেঁধে প্রস্তুত। কেবল আমিই তৈরি হয়ে নিতে পারি নি। এখনই রেলগাড়ির উদ্দেশে মোটরগাড়িতে চড়তে হবে। দ্বারের কাছে মোটরগাড়ি উদ্যত তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করছে–আমাদের সঙ্গীদের কণ্ঠে তেমন জোর নেই, কিন্তু তাদের উৎকণ্ঠা কম প্রবল নয়। অতএব, এইখানেই উঠতে হল। দিনটি চমৎকার। নারকেলগাছের পাতা ঝিল্‌মিল্‌ করছে, ঝর্‌ঝর্‌ করছে, দুলে দুলে উঠছে, সামনেই সমুদ্র স্বগত- উক্তিতে অবিশ্রাম কলধ্বনিমুখরিত।

[মলাক্কা ৩০শে জুলাই ১৯২৭। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

৭

কল্যাণীয়াসু

রানী, এসেছি গিয়ানয়ার রাজবাড়িতে। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে সুনীতি রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। খেতে বসে রাজা আমাকে বললেন একটু সংস্কৃত আওড়াতে। দু-চার রকমের শ্লোক আওড়ানো গেল। সুনীতি একটি শ্লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমনি বললেন, “শার্দূলবিক্রীড়িত” অমনি রাজা সেটা উচ্চারণ করে জানালেন, তিনিও জানেন। এখানকার রাজার মুখে অত বড়ো একটা কড়া সংস্কৃত শব্দ শুনে আমি তো আশ্চর্য। তার পরে রাজা বলে গেলেন, শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, বসন্ততিলক, আরো কতকগুলো নাম যা আমাদের অলংকারশাস্ত্রে কখনো পাই নি। বললেন, তাঁদের ভাষায় এ-সব ছন্দ প্রচলিত। অথচ, মন্দাক্রান্তা বা অনুষ্টুভ এঁরা জানেন না। এখানে ভারতীয় বিদ্যার এই-সব ভাঙাচোরা মূর্তি দেখে মনে হয় যেন ভূমিকম্প হয়ে একটা প্রাচীন মহানগরী ধ্বসে গিয়েছে, মাটির নীচে বসে গিয়েছে- সেই-সব জায়গায় উঠেছে পরবর্তী কালের ঘরবাড়ি চাষ-আবাদ; আবার অনেক জায়গায় সেই পুরোনো কীর্তির অবশেষ উপরে জেগে, এই দুইয়ে মিলে জোড়া-তাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয়।

সেকালের ভারতবর্ষের যা-কিছু বাকি আছে তার থেকে ভারতের তখনকার কালের বিবরণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন, কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষে পশুবধ হত, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হত না। এর থেকে বোঝা যায়, তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ-

শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেন নি।

তার পরে রামায়ণ-মহাভারতের যে-সকল পাঠ এ দেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে যে স্থানে এদের পাঠান্তর তার সমস্তই যে অশুদ্ধ, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাই-বোন; সেই ভাই-বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল; তিনি বললেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্তীকালে এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে।

এই মতটাকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হলে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখতে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসংগত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্য দিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভূত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্রপরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্ছে, দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়; সীতা পৃথিবীর কন্যা, হলরেখার মুখে কুড়িয়ে-পাওয়া; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্ছে, উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হচ্ছে, দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রী অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।

সেইজন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদুর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয় ভাইবোন, আর পরস্পর পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

হরধনুভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার-সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে-অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয় নি; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।

মহাভারতে খাণ্ডববন-দাহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে প্রতিকূল মানবশক্তির আশ্রয় ছিল তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে কেবল-যে অনার্য তা নয়, ইন্দ্র যাঁদের দেবতা তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টিবর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেভাবার চেষ্টা করেছিলেন।

মহাভারতেরও অর্থ পাওয়া যায় লক্ষ্যবেধের মধ্যে। এই শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সংকেত আছে যে, একাগ্রসাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায়; আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। একে একদল স্বীকার করেছিল, একদল স্বীকার করে নি। কৃষ্ণাকে পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কৌরবেরা তাঁকে অপমান করতে ত্রুটি করেন নি। এই যুদ্ধে কুরুসেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য, আর পাণ্ডববীর অর্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। রামের অস্ত্রদীক্ষা যেমন বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে, অর্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছ থেকে। বিশ্বামিত্র স্বয়ং লড়াই করেন নি, কিন্তু লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে; কৃষ্ণও স্বয়ং লড়াই করেন নি কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি; ভগবদগীতাতেই এই যুদ্ধের সত্য, এই যুদ্ধের ধর্ম, ঘোষিত হয়েছে-সেই ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক, যে-কৃষ্ণ কৃষ্ণার সখা, অপমানকালে কৃষ্ণা যাঁকে স্মরণ করেছিলেন বলে তাঁর লজ্জা রক্ষা হয়েছিল, যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞ। রাম দীর্ঘকাল সীতাকে নিয়ে যে-বনে ভ্রমণ করেছিলেন সে ছিল অনার্যদের বন, আর কৃষ্ণাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা ফিরেছিলেন যে-বনে সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বন। পাণ্ডবদের সাহচর্যে এই বনে কৃষ্ণার প্রবেশ ঘটেছিল। সেখানে কৃষ্ণা তাঁর অক্ষয় অন্নপাত্র থেকে অতিথিদের অন্নদান

করেছিলেন। ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের, আর-একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্মের। লঙ্কা ছিল অনার্যশক্তির পুরী, সেইখানে আর্যের হল জয়; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণবিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র, সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে স্থান নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রসারিত করতে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সংকীর্ণ প্রথাকে আঁকড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যারা সত্যকে প্রশস্ত ও গভীর ভাবে গ্রহণ করতে চায়। এক সময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়েছিল; এক পক্ষ বেদমন্ত্রকেই ব্রহ্ম বলতেন, অন্য পক্ষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলে জেনেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন তার পূর্বেই ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে মতের দ্বন্দ্ব তাঁর পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের যে মূল ইতিহাস নানা কাহিনীতে বিজড়িত, তাকে স্পষ্টতর করে দেখতে পাব যখন এখানকার পাঠগুলি মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হবে। কথায় কথায় এখানকার একজনের কাছে শোনা গেল যে, দ্রোণাচার্য ভীমকে কৌশলে বধ করবার জন্যে কোনো-এক অসাধ্য কর্মে পাঠিয়েছিলেন। দ্রুপদ-বিদ্বেষী দ্রোণ যে পাণ্ডবদের অনুকূল ছিলেন না, তার হয়তো প্রমাণ এখানকার মহাভারতে আছে।

রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে আর-একটি কথা আমার মনে আসছে, সেটা এখানে বলে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র দুরকম করে নষ্ট হতে পারে–এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর-এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রামসীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্বাসিতা সীতার গর্ভে যে-যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের অর্থ জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের খেতকে-যে কিরকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে-মানে আন্দাজ করছি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তা হলে লবের

সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য কী হতে পারে, এ কথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।

অন্যদের চিঠি থেকে খবর পেয়ে থাকবে যে, এখানে আমরা প্রকাণ্ড একটা অন্ত্যেষ্টিসৎকারের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছি। মোটের উপরে এটা কতকটা চীনেদের মতো–তারাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এইরকম ধুমধাম সাজসজ্জা বাজনাবাদ্য করে থাকে। কেবল মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির ভঙ্গিটা হিন্দুদের মতো। দাহক্রিয়াটা এরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েছে। কিন্তু, কেমন মনে হয়, ওটা যেন অন্তরের সঙ্গে নেয় নি। হিন্দুরা আত্মাকে দেহের অতীত করে দেখতে চায়, তাই মৃত্যুর পরেই পুড়িয়ে ফেলে দেহের মমতা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। এখানে মৃত দেহকে অনেক সময়েই বহু বৎসর ধরে রেখে দেয়। এই রেখে দেবার ইচ্ছেটা কবর দেবার ইচ্ছেরই সামিল। এদের রীতির মধ্যে এরা দেহটাকে রেখে দেওয়া আর দেহটাকে পোড়ানো, এই দুই উলটো প্রথার মধ্যে যেন রফানিষ্পত্তি করে নিয়েছে। মানুষের মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুধর্ম রফানিষ্পত্তিসূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট করে ফেলে হিন্দুধর্ম ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করে নি, ভেদ রক্ষা করেও সে একটা ঐক্য আনতে চেয়েছে।

কিন্তু, এমন ঐক্য সহজ নয় বলেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকে না। বিভিন্ন বহুকে এক বলে স্বীকার করেও তার মাঝে মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিতে হয়। একে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না, একে বলতে হয় বিভক্ত এক। ঐক্য এতে ভারগ্রস্ত হয়, ঐক্য এতে শক্তিমান হয় না। আমাদের দেশের স্বধর্মানুরাগী অনেকেই বালিদ্বীপের অধিবাসীদের আপন বলে স্বীকার করে নিতে উৎসুক হবেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই নিজের সমাজ থেকে ওদের দূরে ঠেকিয়ে রাখবেন। এইখানে প্রতিযোগিতায় মুসলমানের সঙ্গে আমাদের হারতেই হয়। মুসলমানে মুসলমানে এক মুহূর্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়, হিন্দুতে হিন্দুতে তা লাগে না। এইজন্যেই হিন্দুর ঐক্য আপন বিপুল অংশপ্রত্যংশ নিয়ে কেবলই নড়্‌নড়্ করছে। মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে-যে কেবলমাত্র আপন বল

দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততিবিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিক ভাবে আপন ধর্মের বিস্তার করে। স্বজাতির, এমন কি, পরজাতির লোকের সঙ্গে বিবাহে তার কোনো বাধা নেই। এই অবাধ বিবাহের দ্বারা সে আপন সামাজিক অধিকার সর্বত্র প্রসারিত করতে পারে। কেবলমাত্র রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে নয়, রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূরে দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে। হিন্দু যদি তা পারত তা হলে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম স্থায়ী বিশুদ্ধ ও পরিব্যপ্ত হতে দেরি হত না।

[গিয়ানয়ার ১ আগস্ট, ১৯২৭]

৮

গোলমাল ঘোরাফেরা দেখাশোনা বলাকওয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ফাঁকে ফাঁকে যখন-তখন দু-চার লাইন করে লিখি, ভাবের স্রোত আটকে আটকে যায়, তার সহজ গতিটা থাকে না। একে চিঠি বলা চলে না। কেননা, এর ভিতরে ভিতরে কর্তব্য-পরায়ণতার ঠেলা চলছে-সেটাতে কাজকে এগিয়ে দেয়, ভাবকে হয়রান করে। পাখি-ওড়ায় আর ঘুড়ি-ওড়ায় তফাত আছে। আমি ওড়াচ্ছি চিঠির ছলে লেখার ঘুড়ি, কর্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা, কেবলই হেঁচকে হেঁচকে ওড়াতে হয়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে দু-তিনরকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। গীতার উপদেশ যদি মানতুম, ফললাভের প্রত্যাশা যদি না থাকত, তা হলে পাল-তোলা নৌকার মতো জীবনতরণী তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পারত। চলেছি উজান বেয়ে, গুন টেনে, লগি ঠেলে দাঁড় বেয়ে; পদে পদে জিব বেরিয়ে পড়ছে। আমৃত্যুকাল কোনোদিন কোথাও-যে সহজে ভ্রমণ করতে পারব সে আশা বিড়ম্বনা। পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প; অর্জন করতে করতে গর্জন করতে করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জন করতে করতে, আমার ভ্রমণ-গলা চালিয়ে আমার পা চালানো। পথে বিপথে যেখানে-সেখানে আচমকা আমাকে বক্তৃতা করতে বলে, আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বকে যাই-আমেরিকায় মুড়ি তৈরি করবার কলের মুখ থেকে যেমন মুড়ি বেরোতে থাকে সেইরকম। হাসিও পায় দুঃখও ধরে। পৃথিবীর পনেরো-আনা লোক কবিকে নিয়ে সর্বসমক্ষে এইরকম অপদস্থ করতেই ভালোবাসে; বলে, “মেসেজ দাও।” মেসেজ বলতে কী বুঝায় সেটা ভেবে দেখো। সর্বসাধারণ-নামক নির্বিশেষ পদার্থের উদাসীন কানের কাছে অত্যন্ত নির্বিশেষ ভাবের উপদেশ দেওয়া, যা কোনো বাস্তব মানুষের কোনো বাস্তব কাজেই লাগে না। পরলোকগত বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পাইকেরি প্রথায় পিণ্ডি দেওয়ার মতো-যেহেতু সে-পিণ্ড কেউ খায় না সেইজন্যে তাতে না আছে স্বাদ, না

আছে শোভা। যেহেতু সেটা রসনাহীন ও ক্ষুধাহীন নামমাত্রের জন্য উৎসর্গ-করা সেইজন্যে, সেটাকে যথার্থ খাদ্য করে তোলার জন্যে কারো গরজ নেই। মেসেজ-রচনা সেইরকম রচনা।

আজ বিকেলের গাড়িতে পিনাঙ যেতে হবে। তার আগে, যদি সুসাধ্য হয় তবে নাওয়া আছে, খাওয়া আছে; যদি দুঃসাধ্য হয় তবু একটা মিটিঙে গিয়ে বক্তৃতা আছে; ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, অবকাশ নেই-তার পরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা; তার পরে স্টেশনে মাল্যগ্রহণ, অ্যাড্রেস-শ্রবণ, তদুত্তরে বিনতিপ্রকাশ; তার পরে নতুন বাসায় নতুন জনতার মধ্যে জীবনযাত্রার নতুন ব্যবস্থা; তার পরে ষোলোই তারিখে জাহাজে চড়ে জাভায় যাত্রা; তার পরে নতুন অধ্যায়। ইতি

[১৩ আগস্ট, ১৯২৭]

৯

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, মালয় উপদ্বীপের বিবরণ আমাদের দলের লোকের চিঠিপত্র থেকে নিশ্চয় পেয়েছ। ভালো করে দেখবার মতো, ভাববার মতো, লেখার মতো সময় পাই নি। কেবল ঘুরেছি আর বকেছি। পিনাঙ থেকে জাহাজে চড়ে প্রথমে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে পৌঁছনো গেল। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই বড়ো শহর মাত্রই দেশের শহর নয়, কালের শহর। সবাই আধুনিক। সবাই মুখের চেহারায় একই, কেবল বেশভূষায় কিছু তফাত। অর্থাৎ, কারো-বা পাগড়িটা ঝক্‌ঝকে কিন্তু জামায় বোতাম নেই, ধুতিখানা হাঁটু পর্যন্ত, ছেঁড়া চাদরখানায় ধোপ পড়ে না, যেমন কলকাতা; কারো-বা আগাগোড়াই ফিট্‌ফাট্ ধোয়া-মাজা; উজ্জ্বল বসনভূষণ, যেমন বাটাভিয়া। শহরগুলোর মুখের চেহারা একই বলেছি, কথাটা ঠিক নয়। মুখ দেখা যায় না, মুখোষ দেখি। সেই মুখোষগুলো এক কারখানায় একই ছাঁচে ঢালাই করা। কেউ-বা সেই মুখোষ পরিষ্কার পালিশ করে রাখে, কারো বা হেলায়-ফেলায় মলিন। কলকাতা আর বাটাভিয়া উভয়েই এক আধুনিক কালের কন্যা; কেবল জামাতারা স্বতন্ত্র, তাই আদরযত্নে অনেক তফাত। শ্রীমতী বাটাভিয়ার সিঁথি থেকে চরণচক্র পর্যন্ত গয়নার অভাব নেই। তার উপরে সাবান দিয়ে গা মাজা-ঘষা ও অঙ্গলেপ দিয়ে ঔজ্জ্বল্যসাধন চলছেই। কলকাতার হাতে নোয়া আছে, কিন্তু বাজুবন্দ দেখি নে। তার পরে যে-জলে তার স্নান সে-জলও যেমন, আর যে-গামছায় গা-মোছা তারও সেই দশা। আমরা চিৎপুরবিভাগের পুরবাসী, বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এলুম।

হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন-তিনেক; অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-একসময়ে লিখবেন। কেননা, সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি

ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট-যে হয় না সে দু দিক থেকেই, রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। বুঝতে পারছি, তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজে করে বালিদ্বীপের দিকে রওনা হলুম। ঘণ্টা-কয়েকের জন্যে সুরবায়া শহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক শহর; জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে শহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।

পার হয়ে এলেম বালিদ্বীপে; দেখলেম ধরণীর চিরযৌবনা মূর্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ; বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয়গুলিতে সচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।

এই দ্বীপটুকুতে রেলগাড়ি নেই। রেলগাড়ি আধুনিক কালের বাহন। আধুনিক কালটি অত্যন্ত কৃপণ কাল, কোনো দিকে একটুমাত্র বাহুল্যের বরাদ্দ রাখতে চায় না। এই কালের মানুষ বলে: □□□□ □□ □□□□□।তাই কালের বাজেখরচ বন্ধ করবার জন্যে রেলের এঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে, ধোঁয়া ওগরাতে ওগরাতে, মেদিনী কম্পমান করে দেশদেশান্তরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, এই বালিদ্বীপে বর্তমান কাল শত শত অতীত শতাব্দী জুড়ে এক হয়ে আছে। এখানে কালসংক্ষেপ করবার কোনো দরকার নেই। এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের; যেমন একালের তেমনি সেকালের। ঋতুগুলি যেমন চলেছে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে, নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় তেমনি চলেছে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন করে।

রেলগাড়ি এখানে নেই কিন্তু আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে তাদের জন্যে আছে মোটরগাড়ি। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের দেখাশুনো ভোগ-করা শেষ করা চাই। তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে। এখানকার অরণ্য পর্বত লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছি আর কেবলই মনে হচ্ছে, এখানে পায়ে হেঁটে চলা উচিত। যেখানে পথের দুই ধারে ইমারত সেখানে মোটরের সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুকে দৌড় করালে খুব বেশি লোকসান হয় না; কিন্তু পথের দু ধারে যেখানে রূপের মেলা সেখানকার নিমন্ত্রণ সারতে গেলে গরজের মোটরটাকে গারাজেই রেখে আসতে হয়। মনে নেই কি, শিকার করতে দুষ্যন্ত যখন রথ ছুটিয়েছিলেন তখন তার বেগ কত; এই হচ্ছে যাকে বলে প্রোগ্রেস, লক্ষ্যভেদ করবার জন্যে তাড়াহুড়ো। কিন্তু, তপোবনের সামনে এসে তাঁকে রথ ফেলে নামতে হল, লক্ষ্যসাধনের লোভে নয়, তৃপ্তিসাধনের আশায়। সিদ্ধির পথে- চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে- চলা ধীরে। আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড, প্রবল; তাই আধুনিককালের বাহনের বেগ কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। যা-কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না ক'রে স্পর্শ করেই চলে যায়। এখন হ্যাম্‌লেটের অভিনয় অসম্ভব হল, হ্যাম্‌লেটের সিনেমার হল জিত।

আমাদের মোটর যেখানে এসে থামল সেখানে এক বিপুল উৎসব। জায়গাটার নাম বাংলি। কোনো-এক রাজবংশের কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এর মধ্যে শোকের চিহ্ন নেই। না থাকবারই কথা–রাজার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা, দেবসভায় উত্তীর্ণ, উৎসব তাই নিয়ে। বহু দূর থেকে গ্রামের পথে পথে মেয়ে পুরুষেরা ভারে ভারে বিচিত্ররকমের নৈবেদ্য নিয়ে আসছে; যেন কোন্‌ পুরাণে- বর্ণিত যুগ হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে বেঁচে উঠল; যেন অজন্তার শিল্পকলা চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্যের আলো ভোগ করতে এসেছে। মেয়েদের বেশভূষা অজন্তার ছবিরই মতো। এখানে আবরণবিরলতার স্বাভাবিক আবরু সুন্দর হয়ে দেখা দিল, সেটা চারিদিকের সঙ্গে সুসংগত; এমন-কি, যে-কয়েকজন আমেরিকান মিশনরি দর্শকরূপে এখানে এসেছে, আশা করি, তারাও এই দৃশ্যের সুশোভন সুরুচি সহজ-মনে অনুভব করতে পেরেছে।

যজ্ঞক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এই উপলক্ষে সেখানে অনেকগুলি বাঁশের উঁচু মাচা-বাঁধা ঘরে এখানকার ব্রাহ্মণেরা সুসজ্জিত হয়ে, শিখা বেঁধে, ভূরি ভূরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্প-পত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানারকম মুদ্রা সহযোগে মন্ত্র পড়ছে; তারা কেউ-বা কতরকম অর্ঘ্য-উপকরণ তৈরি করছে। কোথাও-বা এখানকার বহুযন্ত্রমিলিত সংগীত; এক জায়গায় তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়। উৎসবের এত অতিবৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখি নি; অথচ কোথাও অসুন্দর বা বিশৃঙ্খল কিছু নেই; বিপুল সমারোহে দৃশ্যরূপটি বস্তুরাশির অসংলগ্নতায় বা জনতার ঠেলাঠেলিতে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় নি। এতগুলি মানুষের সমাবেশ, অথচ গোলমাল বা নোংরামি বা অব্যবস্থা নেই। উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনেই সমস্ত ভিড়ের লোককে আপনিই সংযত করে বেঁধেছে। সমস্ত ব্যাপারটি এত বৃহৎ, এত বিচিত্র, আর আমাদের পক্ষে এত অপূর্ব যে, এর বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। হিন্দু অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে এ দেশের লোকের চিত্তবৃত্তির মিল হয়ে এই যে সৃষ্টি, এর রূপের প্রাচুর্যটিই বিশেষ করে দেখবার ও ভাববার জিনিস। অপরিমিত উপকরণের দ্বারা নিজেকে অশেষভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা, সেই প্রকাশ কেবলমাত্র বস্তুকে পুঞ্জিত ক'রে নেয়, তাকে নানা নিপুণ রীতিতে সজ্জিত ক'রে।

জাপানের সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার মিল আছে। জাপানের মতোই এখানে দ্বীপটি আয়তনে ছোটো, অথচ এখানে প্রকৃতির রূপটি বিচিত্র, এবং তার সৃষ্টিশক্তি প্রচুরভাবে উর্বরা। পদে পদেই পাহাড় ঝরনা নদী প্রান্তর অরণ্য অগ্নিগিরি সরোবর। অথচ, দেশটি চলাফেরার পক্ষে সুগম, নদীপর্বতের পরিমাণ ছোটো; প্রজাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম, এইজন্যে কৃষির উৎকর্ষ দ্বারা চাষের-যোগ্য সমস্ত জমি সম্পূর্ণরূপে এরা চষে ফেলেছে; খেতে খেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সেঁচ দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা এ দেশে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। এখানে দারিদ্র্য নেই, রোগ নেই, জলবায়ু সুখকর। দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সংগত; সেই প্রকৃতি এখানকার শিল্পকলায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের প্রবর্তনা করেছে।

জাপানের সঙ্গে এর মস্ত একটা তফাত। জাপান শীতের দেশ; জাভা বালি গরমের দেশ। জাপান অন্য শীতের দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা করতে পারলে, জাভা বালি তা পারে নি। আত্মরক্ষার জন্যে যে দৃঢ়নিষ্ঠ অধ্যবসায় দরকার এদের তা ছিল না। গরম হাওয়া প্রাণের প্রকাশকে যেমন তাড়াতাড়ি পরিণত করে তেমনি তাড়াতাড়ি ক্ষয় করতে থাকে। মুহূর্তে মুহূর্তে শক্তিকে সে শিথিল করে, জীবনের অধ্যবসায়কে ক্লান্ত করে দেয়। বাটাভিয়া শহরটি-যে এমন নিখুঁত ভাবে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তার কারণ, শীতের দেশের মানুষ এর ভার নিয়েছে; তাদের শীতের দেশের দেহে শক্তি অনেক কাল থেকে বংশানুক্রমে অস্থিতে মজ্জাতে পেশীতে স্নায়ুতে পুঞ্জীভূত; তাই তাদের অক্লান্ত মন সর্বত্র ও প্রতি মুহূর্তে আপনাকে প্রয়োগ করতে পারে। আমরা কেবলই বলি, “যথেষ্ট হয়েছে, তুমিও যেমন, চলে যাবে।” যত্ন জিনিসটা কেবল হৃদয়ের জিনিস নয়, শক্তির জিনিস। অনুরাগের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে শক্তির প্রাচুর্য চাই। শক্তিসঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে। বৈরাগ্য নিজের উপর থেকে সমস্ত দাবি কমিয়ে দেয়। বাইরের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য, অব্যবস্থা, সমস্তই মেনে নেয়। নিজেকে ভোলাবার জন্যে বলতে চেষ্টা করে যে, ওগুলো সহ্য করার মধ্যে যেন মহত্ত্ব আছে। যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবি মেনে নিতে আনন্দ পায়; এইজন্যেই সে জোরের সঙ্গে বেঁচে থাকে, ধ্বংসের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না। য়ুরোপে গেলে সব চেয়ে আমার চোখে পড়ে মানুষের এই সদাজাগ্রত যত্ন। যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়ান্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়ালকে মানবে না, বলবে না “ধরে নেওয়া যাক”, বলবে না “সর্বজ্ঞ ঋষি এই কথা বলে গেছেন”। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে, যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়; সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, গুরুবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন, আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে-নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারিদিকে যে প্রভূত আবর্জনার অবরোধ জমে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণপথে চলে, এগোয় না, কেবলই ঘোরে। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ

করে, হাজার বছর আগে যে- মন্দির তৈরি হয়েছে ঠিক তারই নকল করবার জন্যে। তার বেশি তার সাহস নেই, ক্লান্ত মনের শক্তি নেই; পাখির অসাড় ডানা খাঁচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় না। খাঁচার কাছে হার মেনে যে-পাখি চিরকালের মতো ধরা দিয়েছে সমস্ত বিশ্বের কাছে তাকে হার মানতে হল।

এ দেশে এসে প্রথমে আনন্দ হয় এখানকার সব অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে। তার পরে ক্রমে মনে সন্দেহ হতে থাকে, এ হয়তো খাঁচার সৌন্দর্য, নীড়ের সৌন্দর্য নয়–এর মধ্যে হয়তো চিত্তের স্বাধীনতা নেই। অভ্যাসের যন্ত্রে নিখুঁত নকল শত শত বৎসর ধরে ধারাবাহিক ভাবে চলেছে। আমরা যারা এখানে বাহির থেকে এসেছি আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমানভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া; সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে, "আমি হার মানলুম।" সে দীনভাবে বলছে, "এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।" নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব–বৈরাগ্যমেবাভয়ম্, অর্থাৎ, বৈনাশ্যমেবাভয়ম্।

সেদিন বাংলিতে আমরা যে অনুষ্ঠান দেখেছি সেটা প্রেতাত্মার স্বর্গারোহণপর্ব। মৃত্যু হয়েছে বহু পূর্বে; এতদিনে আত্মা দেবসভায় স্থান পেয়েছে বলে এই বিশেষ উৎসব। সুখবতী-নামক জেলায় উবুদ-নামক শহরে হবে দাহক্রিয়া, আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বর। ব্যাপারটার মধ্যে আরো অনেক বেশি সমারোহ থাকবে–কিন্তু তবু সেই মাদ্রাজি চেটির পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মন্দির। এ বহু বহু শতাব্দীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই চলেছে, এর আর অন্ত নেই। এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভবরকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে–যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম

চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীত কালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধরে, বর্তমানকালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমানকালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত; মনে থাকা উচিত, তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি, সেটা এইখানে তুলে দিয়ে এই দীর্ঘ পত্র শেষ করি।

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে,
“আমার সঙ্গে লড়াই করে কখ্‌খনো কি পার।
বারে বারেই হার।”
আমি বললেম, “তাই বৈকি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক দেখি তো লড়াই।”
“আচ্ছা, তবে দেখাই তোমায়” এই বলে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশায় তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত॥
বারে বারে শুধায় আমায়, “বলো তোমার হার হয়েছে না কি।”
আমি কইলেম, “বলতে হবে তা কি।
ধুলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।
এই কথা কি জান–
আমার কাছে, নন্দগোপাল, যখনই হার মান,
আমারই সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব, যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারই শেষ জিত।

ইতি

[৩০শে আগস্ট, ১৯২৭। কারেম আসন। বালি]

১০

কল্যাণীয়াসু

মীরা, যেখানে বসে লিখছি এ একটা ডাকবাঙলা, পাহাড়ের উপরে। সকালবেলা শীতের বাতাস দিচ্ছে। আকাশে মেঘগুলো দল বেঁধে আনাগোনা করছে, সূর্যকে একবার দিচ্ছে ঢাকা, একবার দিচ্ছে খুলে। পাহাড় বললে যে-ছবি মনে জাগে এ একেবারেই সেরকম নয়। শৈলশিখরশ্রেণী কোথাও দেখা যাচ্ছে না–বারান্দা থেকে অনতিদূরেই সামনে ঢালু উপত্যকা নেমে গিয়েছে, তলায় একটি ক্ষীণ জলের ধারা এঁকে বেঁকে চলেছে; সামনে অন্য পারের পাড়ি অর্ধচন্দ্রের মতো, তার উপরে নারকেলবন আকাশের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

উপর থেকে নীচে পর্যন্ত থাকে থাকে শস্যের খেত। পাহাড়ের বুক বেয়ে একটা ভাঙাচোরা পথ পরপারের গ্রামের থেকে জল পর্যন্ত নেমে গেছে। জলধারার কাছেই একটি উৎস। এই উৎসকে এ দেশের লোকে পবিত্র বলে জানে; সমস্ত দিন দেখি, মেয়েরা স্নান করে, জল তুলে নিয়ে যায়। এরা বলে, এই জলে স্নান করলে সর্ব পাপ মোচন হয়। বিশেষ বিশেষ পার্বণ আছে যখন বিস্তর লোক এখানে পুণ্যস্নান করতে আসে। এই জায়গাটার নাম "তীর্ত আম্পুল'। তীর্ত অর্থাৎ তীর্থ, আম্পুল মানে উৎস–উৎসতীর্থ।

এই উৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বহুকাল পূর্বে এক রাজার এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটি রাজার এক পারিষদকে ভালোবেসেছিল। পারিষদের মনেও যে ভালোবাসা ছিল না তা নয়, কিন্তু রাজকন্যাকে বিয়ে করবার যোগ্য তার জাতিমর্যাদা নয় জেনে রাজার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে রাজকন্যার ভালোবাসা কর্তব্যবোধে প্রত্যাখ্যান করে। রাজকন্যা রাগ করে তার পানীয় দ্রব্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। যুবক একটুখানি পান

করেই ব্যাপারখানা বুঝতে পারে, কিন্তু পাছে রাজকন্যার নামে অপবাদ আসে তাই পালিয়ে এই জায়গাকার বনে এসে গোপনে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়। দেবতারা দয়া করে এই পুণ্য উৎসের জল খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে দেন।

হিন্দু ভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কিরকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অমিশ্র ভাবে নেই; এখানকার লোকেরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে; তার ভঙ্গীটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের। প্রথম দিন এসেই এক জায়গায় কোন্-এক রাজার অন্ত্যেষ্টিসৎকার দেখতে গিয়েছিলুম। সাজসজ্জা-আয়োজনের উপকরণ আমাদের সঙ্গে মেলে না; উৎসবের ভাবটা ঠিক আমাদের শ্রাদ্ধের ভাব নয়; সমারোহের বাহ্য দৃশ্যটা ভারতবর্ষের কোনো কিছুর অনুরূপ নয়; তবুও এর রকমটা আমাদের মতোই; মাচার উপরে এখানকার চূড়া-বাঁধা ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা নেড়ে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে হাতের আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গী করে বিড়্‌বিড়্ শব্দে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। আবৃত্তিতে ও অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র স্খলন হলেই সমস্ত অশুদ্ধ ও ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে নেই। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এরা “গায়ত্রী’ শব্দটা জানে কিন্তু মন্ত্রটা ঠিক জানে না। কেউ-বা কিছু কিছু টুকরো জানে। মনে হয়, এক সময়ে এরা সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম পেয়েছিল, তার দেবদেবী রীতিনীতি উৎসব-অনুষ্ঠান পুরাণস্মৃতি সমস্তই ছিল। তার পরে মূলের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ভারতবর্ষ চলে গেল দূরে-হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হল নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কষে বাঁধলে, ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল এ কথা সে ভুললে। কিন্তু, সমুদ্রপারের আত্মীয়-বাড়িতে তার অনেক বাণী, অনেক মূর্তি, অনেক চিহ্ন, অনেক উপকরণ পড়ে আছে বলে সেই আত্মীয় তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারলে না। পথে ঘাটে পদে পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সংস্কার হতে পায় নি বলে কালের হাতে সেই-সব অভিজ্ঞান কিছু গেছে ক্ষয়ে, কিছু বেঁকেচুরে, কিছু গেছে লুপ্ত হয়ে।

সেই-সব অভিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সংগতি আর পাওয়া যায় না। তার অর্থ কিছু গেছে ঝাপসা হয়ে, কিছু গেছে টুকরো হয়ে। তার ফল হয়েছে এই, যেখানে-যেখানে ফাঁক

পড়েছে সেই ফাঁকটা এখানকার মানুষের মন আপন সৃষ্টি দিয়ে ভরিয়েছে। হিন্দু-ধর্মের ভাঙাচোরা কাঠামো নিয়ে এখানকার মানুষ আপনার একটা ধর্ম, একটা সমাজ, গড়ে তুলেছে। এখানকার এক সময়ের শিল্পকলায় দেখা যায় পুরোপুরি হিন্দু প্রভাব; তার পরে দেখা যায় সে-প্রভাব ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন। তবু যে-ক্ষেত্রকে হিন্দু উর্বর করে দিয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে এখানকার স্বস্থানীয় প্রতিভা প্রচুরভাবে আপনার ফসল ফলিয়েছে। এখানে একটা বহুছিদ্র পুরোনো ইতিহাসের ভূমিকা দেখি; সেই আধভোলা ইতিহাসের ছেদগুলো দিয়ে এদেশের স্বকীয় চিত্ত নিজেকে প্রকাশ করছে।

বালিতে সব-প্রথমে কারেম-আসন বলে একজায়গার রাজবাড়িতে আমার থাকবার কথা। সেখানকার রাজা ছিলেন বাংলির শ্রাদ্ধ-উৎসবে। পারিষদসহ বালির ওলন্দাজ গবর্নর সেখানে মধ্যাহ্নভোজন করলেন, সেই ভোজে আমরাও ছিলেম। ভোজ শেষ করে যখন উঠলেম তখন বেলা তিনটে। সকালে সাড়ে ছটার সময় জাহাজ থেকে নেমেছি; ঘাটের থেকে মোটরে আড়াই ঘণ্টা ঝাঁকানি ও ধুলো খেয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন। এখানে ঘোরাঘুরি দেখাশুনা সেরে বিনা স্নানেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেছি; দীর্ঘকালপ্রসারিত সেই ভোজে আহার ও আলাপ- আপ্যায়ন সেরে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটরগাড়িতে চড়ে আবার সুদীর্ঘপথ ভেঙে চললুম তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদকে এরা পুরী বলে। রাজার ভাষা আমি জানি নে, আমার ভাষা রাজা বোঝেন না–বোঝবার লোকও কেউ সঙ্গে নেই। চুপ করে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলুম।

মস্ত সুবিধে এই, এখানকার প্রকৃতি বালিনি ভাষায় কথা কয় না; সেই শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর অরসিক মোটরগাড়িটাকে মনে মনে অভিশাপ দিই। মনে পড়ল, কখনো কখনো শুষ্কচিত্তে গাইয়ের মুখে গান শুনেছি; রাগিণীর যেটা বিশেষ দরদের জায়গা, যেখানে মন প্রত্যাশা করছে, গাইয়ের কণ্ঠ অত্যুচ্চ আকাশের চিলের মতো পাখাটা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে কিম্বা দুই-একটা মাত্র মীড়ের ঝাপটা দেবে, গানের সেই মর্মস্থানের উপর দিয়ে যখন সেই সংগীতের পালোয়ান তার তানগুলোকে

লোটন-পায়রার মতো পালটিয়ে পালটিয়ে উড়িয়ে চলেছে, তখন কিরকম বিরক্ত হয়েছি। পথের দুই ধারে গিরি অরণ্য সমুদ্র, আর সুন্দর সব ছায়াবেষ্টিত লোকালয়, কিন্তু মোটরগাড়িটা দুন-চৌদুন মাত্রায় চাকা চালিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছে, কোনো-কিছুর 'পরে তার কিছুমাত্র দরদ নেই; মনটা ক্ষণে ক্ষণে বলে উঠছে, "আরে, রোসো রোসো, দেখে নিই।" কিন্তু, এই কল-দৈত্য মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়; তার একমাত্র ধুয়ো, "সময় নেই, সময় নেই।" এক জায়গায় যেখানে বনের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নীল সমুদ্র দেখা গেল রাজা আমাদের ভাষাতেই বলে উঠলেন "সমুদ্র"; আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত হতে দেখে আউড়ে গেলেন, "সমুদ্র, সাগর, অব্ধি, জলাঢ্য।" তার পরে বললেন, "সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।" তার পরে পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "অদ্রি"; তার পরে বলে গেলেন, "সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয়, ঋষ্যমূক।" এক জায়গায় পাহাড়ের তলায় ছোটো নদী বয়ে যাচ্ছিল, রাজা আউড়িয়ে গেলেন, "গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, সরস্বতী।" আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল; তখন সে আপনার নদীপর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন করে বাঁধা হয়েছে–দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানসসরোবর, পশ্চিমসমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্ব সমুদ্রে গঙ্গাসংগম–যাতে করে তীর্থভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষকে চেনবার এমন উপায় আর কিছু হতে পারে না। তখন পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে হত সুতরাং তীর্থভ্রমণের দ্বারা কেবল যে ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানাজাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হত। সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সত্যসাধনা ছিল বলেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হয়ে উঠেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা কখনো ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চায় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রসভার রঙ্গমঞ্চের উপর ক্ষণিক মিলনের অভিনয়কেই সে মিলন বলে নিজেকে ভোলাতে চায় না। সেদিন মিলনের সাধনা ছিল অকৃত্রিম নিষ্ঠার সাধনা।

সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্তিধ্যান সমুদ্র পার হয়ে পূর্বমহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপপ্রান্তে এমন করে স্থান পেয়েছিল যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যান-মন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠল, এতে আমার মনে ভারি বিস্ময় লাগল। এই-সব ভৌগোলিক নামমালা এদের মনে আছে বলে নয়, কিন্তু যে-প্রাচীন যুগে এই নামমালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল সেই যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিল সেই কথা মনে ক'রে। সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জানছিল আর সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে, ব্যাপ্ত করবার জন্যে, কিরকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে-যে-দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে।

রাজা কিরকম উৎসাহের সঙ্গে হিমালয় বিন্ধ্যাচল গঙ্গা যমুনার নাম করলেন, তাতে কিরকম তাঁর গর্ব বোধ হল! অথচ, এ ভূগোল বস্তুত তাঁদের নয়; রাজা য়ুরোপীয় ভাষা জানেন না, ইনি আধুনিক স্কুলে-পড়া মানুষ নন, সুতরাং পৃথিবীতে ভারতবর্ষ জায়গাটি-যে কোথায় এবং কিরকম, সে-সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর অস্পষ্ট ধারণা, অন্তত বাহ্যত এ ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁদের কোনো ব্যবহারই নেই; তবুও হাজার বছর আগে এই নামগুলির সঙ্গে যে-সুর মনে বাঁধা হয়েছিল সেই সুর আজও এ দেশের মনে বাজছে। সেই সুরটি কত বড়ো খাঁটি সুর ছিল তাই আমি ভাবছি। আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে-জয়গান রচনা করেছি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি-বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গার নামও আছে। কিন্তু, আজ আমার মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্রপর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশপরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে।

তার পরে রাজা আউড়ে গেলেন সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ-অর্থাৎ, তখনকার দিনে ভারতবর্ষ বিশ্বভূবৃত্তান্ত যেরকম কল্পনা করেছিল তারই স্মৃতি। আজ নূতন জ্ঞানের প্রভাবে সেই স্মৃতি নির্বাসিত, কেবল তা পুরাণের জীর্ণ পাতায় আটকে রয়েছে,

কিন্তু এখানকার কণ্ঠে এখনো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্বনিত। তার পরে রাজা চার বেদের নাম, যম বরুণ প্রভৃতি চার লোকপালের নাম, মহাদেবের নামাষ্টক বলে গেলেন; ভেবে ভেবে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের নাম বলতে লাগলেন, সবগুলি মনে এল না।

রাজপুরীতে প্রবেশ করেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো; এখানকার চারজন ব্রাহ্মণ–একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারি; মাথায় মস্ত উঁচু কারুখচিত টুপি, টুপির উপরিভাগে কাঁচের তৈরি এক-একটা চূড়া। এঁরা চারজন পাশাপাশি বসে আপন-আপন দেবতার স্তবমন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। একজন প্রাচীনা এবং একজন বালিকা অর্ঘ্যের থালি হাতে করে দাঁড়িয়ে। সবসুদ্ধ সাজসজ্জা খুব বিচিত্র ও সমারোহবিশিষ্ট। পরে শোনা গেল, এই মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে আমারই আগমন উপলক্ষে। রাজা বললেন, আমার আগমনের পুণ্যে প্রজাদের মঙ্গল হবে, ভূমি সুফলা হবে, এই কামনায় স্তবমন্ত্রের আবৃত্তি। রাজা বিষ্ণুবংশীয় বলে নিজের পরিচয় দিলেন।

বেলা সাড়ে চারটের সময় স্নান করে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। কারো মুখে কথা নেই। ঘণ্টা-দুয়েক এই ভাবে যখন গেল তখন রাজা স্থানীয় বাজার থেকে বোম্বাই প্রদেশের এক খোজা মুসলমান দোকানদারকে তলব দিয়ে আনালেন। কী আমার প্রয়োজন কিরকম আহারাদির ব্যবস্থা আমার জন্যে করতে হবে ইত্যাদি প্রশ্ন। আমি রাজাকে জানাতে বললুম, তিনি যদি আমাকে ত্যাগ করে বিশ্রাম করতে যান তা হলেই আমি সব চেয়ে খুশি হব।

তার পরদিনে রাজবাড়ির কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথিপত্র নিয়ে উপস্থিত। একটি পুঁথি মহাভারতের ভীষ্মপর্ব। এইখানকার অক্ষরেই লেখা; উপরের পংক্তি সংস্কৃত ভাষায়, নীচের পংক্তিতে দেশী ভাষায় তারই অর্থব্যাখ্যা। কাগজের একটি পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক লেখা। সেই শ্লোক রাজা পড়ে যেতে লাগলেন; উচ্চারণের বিকৃতি থেকে বহু কষ্টে তাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করা গেল। সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ। চিত্তবুদ্ধি,

ত্রি-অক্ষরাত্মক ওঁ, চন্দ্রবিন্দু এবং অন্য সমস্ত শব্দ ও ভাবনা বর্জন করে শুদ্ধ চৈতন্যযোগে সুখমাপ্নুয়াৎ-এই হচ্ছে সাধনা। আমি রাজাকে আশ্বাস দিলেম যে, আমরা এখানে যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঠিয়ে দেব, তিনি এখানকার গ্রন্থগুলি থেকে বিকৃত ও বিস্মৃত পাঠ উদ্ধার করে তার অর্থব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন।

এদিকে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হতে চলল। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারলুম, আমার শক্তিতে কুলোবে না। সৌভাগ্যক্রমে সুনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন; তাঁর অশান্ত উদ্যম, অদম্য উৎসাহ। তিনি ধুতি প'রে, কোমরে পট্টবস্ত্র জড়িয়ে, "পেদণ্ড' অর্থাৎ এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের পূজোপকরণ ছিল; পূজাপদ্ধতি তাদের দেখিয়ে দিলেন। আলাপ-আলোচনায় সকলকেই তিনি আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন।

যখন দেখা গেল, আমার শরীর আর সইতে পারছে না, তখন আমি রাজপুরী থেকে পালিয়ে এই আম্পুল-তীর্থাশ্রমেষু নির্বাসন গ্রহণ করলুম। এখানে লোকের ভিড় নেই, অভ্যর্থনা-পরিচর্যার উপদ্রব নেই। চারদিকে সুন্দর গিরিব্রজ, শস্যশামলা উপত্যকা, জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎসজলসঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ, শৈলতটে নির্মল নীলাকাশে নারিকেল শাখার নিত্য আন্দোলন; আমি ব'সে আছি বারান্দায়, কখনো লিখছি, কখনো সামনে চেয়ে দেখছি। এমন সময়ে হঠাৎ এসে থামল এক মোটর- গাড়ি। গিয়ানয়ারের রাজা ও এই প্রদেশের একজন ওলান্দাজ রাজপুরুষ নেমে এলেন। এঁর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ। অন্তত এক রাত্রি যাপন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আপনিই মহাভারতের কথা উঠল। মহাভারতের যে-কয়টা পর্ব এখনো এখানে পাওয়া যায় তাই তিনি অনেক ভেবে ভেবে আউড়িয়ে গেলেন। বাকি পর্ব কী তাই তিনি জানতে চান। এখানে কেবল আছে, আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, আশ্রমবাসপর্ব, মূষলপর্ব, প্রস্থানিকপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব।

মহাভারতের কাহিনীগুলির উপরে এ দেশের লোকের চিত্ত বাসা বেঁধে আছে। তাদের আমোদে আহ্লাদে কাব্যে গানে অভিনয়ে জীবনযাত্রায় মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলি বিচিত্রভাবে বর্তমান। অর্জুন এদের আদর্শ পুরুষ। এখানে মহাভারতের গল্পগুলি কিরকম বদলে গেছে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। সংস্কৃত মহাভারতের শিখণ্ডী এখানে শ্রীকান্তি নাম ধরেছে। শ্রীকান্তি অর্জুনের স্ত্রী। তিনি যুদ্ধের রথে অর্জুনের সামনে থেকে ভীষ্মবধে সহায়তা করেছিলেন। এই শ্রীকান্তি এখানে সতী স্ত্রীর আদর্শ।

গিয়ানয়ারের রাজা আমাকে অনুরোধ করে গেলেন, আজ রাত্রে মহাভারতের হারানো পর্ব প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি তাঁকে সুনীতির কথা বলেছি; সুনীতি তাঁকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।

ভারতের ভূগোলস্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে আন্দোলিত হচ্ছে। নদীর নামমালার মধ্যে সিন্ধু ও শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চনদের নাম নেই, ব্রহ্মপুত্রের নামও বাদ পড়েছে। অথচ, দক্ষিণের প্রধান নদীগুলির নাম দেখছি। এর থেকে বোঝা যায়, সেই যুগে পাঞ্জাবপ্রদেশ শক হূন যবন পারসিকদের দ্বারা বারবার বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে যেন বিদ্যায় সভ্যতায় স্খলিত হয়ে পড়েছিল; অপর পক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা অভিষিক্ত ভারতের পূর্বতম দেশ তখনো যথার্থরূপে হিন্দুভারতের অঙ্গীভূত হয় নি।

এই তো গেল এখানকার বিবরণ। আমার নিজের অবস্থাটা যেরকম দেখছি তাতে এখানে আমার ভ্রমণ সংক্ষেপ করতে হবে।

৩১ আগস্ট, ১৯২৭। কায়েম আসন। বালি

১১

কল্যাণীয়েসু,

রথী, বালিদ্বীপটি ছোটো, সেইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুসজ্জিত সম্পূর্ণতা। গাছে-পালায় পাহাড়ে-ঝরনায় মন্দিরে-মূর্তিতে কুটীরে-ধানখেতে হাটে-বাজারে সমস্তটা মিলিয়ে যেন এক। বেখাপ কিছু চোখে ঠেকে না। ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট বাইরে থেকে কারখানা-ওয়ালাদের এই দ্বীপে আসতে বাধা দিয়েছে; মিশনরিদেরও এখানে আনাগোনা নেই। এখানে বিদেশীদের জমি কেনা সহজ নয়, এমন-কি, চাষবাসের জন্যেও কিনতে পারে না। আরবি মুসলমান, গুজরাটের খোজা মুসলমান, চীনদেশের ব্যাপারীরা এখানে কেনা-বেচা করে–চারদিকের সঙ্গে সেটা বেমিল হয় না। গঙ্গার ধার জুড়ে দ্বাদশ দেউলগুলিকে লজ্জিত করে বাংলাদেশের বুকের উপর জুটমিল যে নিদারুণ অমিল ঘটিয়েছে এ সেরকম নয়। গ্রামের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গ্রামের লোকেরই হাতে। এখানে খেতে জলসেচের আর চাষবাসের যে- রীতিপদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট। এরা ফসল যা ফলায় পরিমাণে তা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি।

কাপড় বোনে নানা রঙচঙ ও কারুকৌশলে। অর্থাৎ, এরা কোনো মতে ময়লা ট্যানা কোমরে জড়িয়ে শরীরটাকে অনাদৃত করে রাখে না। তাই, যেখানে কোনো কারণে ভিড় জমে, বর্ণচ্ছটার সমাবেশে সেখানটা মনোরম হয়ে ওঠে। মেয়েদের উত্তর অঙ্গ অনাবৃত। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে তারা বলে, “আমরা কি নষ্ট মেয়ে যে বুক ঢাকব।” শোনা গেল, বালিতে বেশ্যারাই বুকে কাপড় দেয়। মোটের উপর এখানকার মেয়ে-পুরুষের দেহসৌষ্ঠব ও মুখের চেহারা ভালোই। বেঢপ মোটা বা রোগা আমি তো এপর্যন্ত দেখি নি। এখানকার পরিপুষ্ট শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে এখানকার পাটল রঙের নধরদেহ গোরু, এখানকার সুস্থ

সবল পরিতৃপ্ত প্রসন্ন ভাবের মানুষগুলি, মিলে গেছে। ছবির দিক থেকে দেখতে গেলে এমন জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

নন্দলাল এখানে এলেন না ব'লে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হয়; এমন সুযোগ তিনি আর-কোথাও কখনো পাবেন না; মনে আছে, কয়েকবৎসর আগে একজন নামজাদা আমেরিকান আর্টিস্ট আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, এমন দেশ তিনি আর-কোথাও দেখেন নি। আর্টিস্টের চোখে পড়বার মতো জিনিস এখানে চারদিকেই। অন্নসচ্ছলতা আছে ব'লেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘরদুয়ার আচার- অনুষ্ঠান আসবাবপত্রকে শিল্পকলায় সজ্জিত করবার চেষ্টা সফল হতে পেরেছে। কোথাও হেলা-ফেলার দৃশ্য দেখা গেল না। গ্রামে গ্রামে সর্বত্র চলছে নাচ, গান, অভিনয়; অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে, গ্রামের লোকের পেটে খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। পথে আশে-পাশেই প্রায়ই নানাপ্রকার মূর্তি ও মন্দির। দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই, ভিক্ষুক এ-পর্যন্ত চোখে পড়ল না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হল, এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন। গ্রামের সমগ্র প্রাণটি সকল দিকে পরিপূর্ণ।

এ দেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেলবন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দুলছে তেমনি এখানকার সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে; এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে এমন কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমত অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেল, এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের

আকারে গড়ে তোলে। মানুষের সকল ঘটনারই বাহ্যরূপ চলা-ফেরায়। কোনো একটা অসামান্য ঘটনাকে পরিদৃশ্যমান করতে চাইলে তার চলা ফেরাকে ছন্দের সুষমাযোগে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সংগত। বাণীর দিকটাকে বাদ দিয়ে কিম্বা খাটো করে কেবলমাত্র গতিরূপটিকে ছন্দের উৎকর্ষ দেওয়া এখানকার নাচ। পৌরাণিক যে-অ্যাখ্যায়িকা কাব্যে কেবলমাত্র কানে শোনার বিষয়, এরা সেইটেকেই কেবলমাত্র চোখে দেখার বিষয় করে নিয়েছে। কাব্যের বাহন বাক্য, সেই বাক্যের ছন্দ-অংশ সংগীতের বিশ্বজনীন নিয়মে চালিত; কিন্তু তার অর্থ-অংশ কৃত্রিম, সেটা সমাজে পরস্পরের আপোষে তৈরি-করা সংকেতমাত্র। দুইয়ের যোগে কাব্য। গাছ শব্দটা শুনলে গাছ তারাই দেখে যাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা আপোষে বোঝাপড়া আছে। তেমনি এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যানবর্ণনা চলে না, সংকেতও আছে; এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভক্তীসংগীতে। এদের নাচে যুদ্ধের যে-রূপ দেখি কোনো রণক্ষেত্রে সেরকম যুদ্ধ দূরতঃ-ও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো স্বর্গে এমন বিধি থাকে যে, ছন্দে যুদ্ধ করতে হবে, এমন যুদ্ধ যাতে ছন্দ-ভঙ্গ হলে সেটা পরাভবেরই শামিল হয়, তবে সেটা এইরকম যুদ্ধই হত। বাস্তবের সঙ্গে এই অনৈক্য নিয়ে যাদের মনে অশ্রদ্ধা বা কৌতুক জন্মায় শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক পড়েও তাদের হাসা উচিত-কেননা, তাতে লড়তে লড়তেও ছন্দ, মরতে মরতেও তাই। সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি, সেই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত করতে গেলে আখ্যানকে নাচে দাঁড়-করানো চলে। বলা বাহুল্য, বাইনাচ প্রভৃতি যে-সব পদার্থকে আমরা নাচ বলি তার আদর্শ এ নাচের নয়। জাপানে কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেছি; তাতে কথা আছে বটে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে; বড়ো আশ্চর্য তার শক্তি। নাটকে আমরা যখন ছন্দোময় বাক্য ব্যবহার করি তখন সেইসঙ্গে চলাফেরা হাবভাব যদি সহজ রকমেরই রেখে দেওয়া হয় তা হলে সেটা অসংগত হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নামেতেই প্রকাশ পায়, আমাদের দেশে একদিন নাট্য অভিনয় সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে

অডিয়েন্‌স্‌, অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু, ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যেই অভিনয়।

এই তো গেল নাচের দ্বারা অভিনয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নাচও আছে। পরশু রাত্রে সেটা গিয়ান্‌য়ারের রাজবাড়িতে দেখা গেল। সুন্দর-সাজ-করা দুটি ছোটো মেয়ে–মাথায় মুকুটের উপর ফুলের দণ্ডগুলি একটু নড়াতেই দুলে ওঠে। গামেলান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দুজনে মিলে নাচতে লাগল। এই বাদ্যসংগীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। আমাদের দেশের জলতরঙ্গ বাজনা আমার কাছে সংগীতের ছেলেখেলা বলে ঠেকে। কিন্তু, সেই জিনিসটিকে গম্ভীর, প্রশস্ত, সুনিপুণ বহুযন্ত্রমিশ্রিত বিচিত্র আকারে এদের বাদ্যসংগীতে যেন পাওয়া যায়। রাগরাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না; যে-অংশে মেলে সে হচ্ছে এদের মৃদঙ্গের ধ্বনি, সঙ্গে করতালও আছে। ছোটো বড়ো ঘণ্টা এদের এই সংগীতের প্রধান অংশ। আমাদের দেশের নাট্যশালায় কন্সর্ট বাজনার যে নূতন রীতি হয়েছে এ সেরকম নয়; অথচ, য়ুরোপীয় সংগীতে বহুযন্ত্রের যে-হার্মিনি এ তাও নয়। ঘণ্টার মতো শব্দে একটা মূল স্বরসমাবেশ কানে আসছে; তার সঙ্গে নানাপ্রকার যন্ত্রের নানারকম আওয়াজ যেন একাট কারুশিল্পে গাঁথা হয়ে উঠছে। সমস্তটাই যদিও আমাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, তবু শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে। এই সংগীত পছন্দ করতে য়ুরোপীয়দেরও বাধে না।

গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে; তার শ্রী অত্যন্ত মনোহর। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে-আলোড়ন তার কী চারুতা, কী বৈচিত্র্য, কী সৌকুমার্য, কী সহজ লীলা। অন্য নাচে দেখা যায়, নটী তার দেহকে চালনা করছে; এদের দেখে মনে হতে লাগল, দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসাহিত নাচের ফোয়ারা। বারো বছরের পরে এই মেয়েদের আর নাচতে দেওয়া হয় না; বারো বছরের পরে শরীরের এমন সহজ সুকুমার হিল্লোল থাকা সম্ভব নয়।

সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর-একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোষপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোষ এনেছিলুম তার থেকে বেশ বোঝা যায় মুখোষ তৈরি এক প্রকারের বিশেষ কল্যাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপনা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক-একরকম শ্রেণী নির্দেশ করে। মুখোষ তৈরি যে-গুণী করে সে সেই শ্রেণীপ্রকৃতিকে মুখোষে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষশ্রেণীর মুখের ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোষ প'রে এলে আমরা তখনই দেখতে পাই, একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত, অভিনেতা ভাব অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোষে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোষের সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গি করা। মূল ধুয়োটা তার বাঁধা; এমন করে তান দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিচ্ছু অসংগত না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখলুম।

অভিনয়ের সঙ্গে এদের কণ্ঠসংগীত যা শুনেছি তাকে সংগীত বলাই চলে না। আমাদের কানে অত্যন্ত বেসুরো এবং উৎকট ঠেকে। এখানে আমরা তো গ্রামের কাছেই আছি; এরা কেউ একলা কিম্বা দল বেঁধে গান গাচ্ছে, এ তো শুনি নি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে চাঁদ উঠেছে অথচ কোথাও গান ওঠে নি, এ সম্ভব হয় না। এখানে সন্ধ্যার আকাশে নারকেলগাছগুলির মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিচ্ছে, গ্রামে কুঁকড়ো ডাকছে, কুকুর ডাকছে, কিন্তু কোথাও মানুষের গান নেই।

এখানকার একটা জিনস বার বার লক্ষ্য করে দেখেছি, ভিড়ের লোকের আত্মসংযম। সেদিন গিয়ান্‌য়ারের রাজবাড়িতে যখন অভিনয় হচ্ছিল চারদিকে অবারিত লোকের সমাগম। সুনীতিকে ডেকে বললুম, মেয়েদের কোলে শিশুদের আর্তরব শুনি নে কেন। নারীকণ্ঠই বা এমন সম্পূর্ণ নীরব থাকে কোন্ আশ্চর্য শাসনে। মনে পড়ে, কলকাতার থিয়েটারে মেয়েদের কলালাপ ও শিশুদের কান্না বন্যার মতো কমেডি ও ট্রেজেডি

ছাপিয়ে দিয়ে কিরকম অসংযত অসভ্যতার হিল্লোল তোলে। সেদিন এখানে দুই-একটি মেয়ের কোলে শিশুও দেখেছি কিন্তু তারা কাঁদল না কেন।

একটা জিনিস এখানে দেখা গেল যা আর কোথাও দেখি নি। এখানকার মেয়েদের গায়ে গহনা নেই। কখনো কখনো কারো এক হাতে একটা চুড়ি দেখেছি, সেও সোনার নয়। কানে ছিদ্র করে শুকনো তালপাতার একটি গুটি পরেছে। বোধ হচ্ছে, যেন অজন্তার ছবিতেও এরকম কর্ণভূষণ দেখেছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এদের আর-সকল কাজেই অলংকারের বাহুল্য ছাড়া বিরলতা নেই। যেখানে সেখানে পাথরে কাঠে কাপড়ে নানা ধাতুদ্রব্যে এরা বিচিত্র অলংকার সমস্ত দেশে ছড়িয়ে রেখেছে, কেবল এদের মেয়েদের গায়েই অলংকার নেই।

আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায়, অলংকৃত জিনিসের প্রধান রচনাস্থান পুরোনো শহরগুলি যেখানে মুসলমান বা হিন্দু প্রভাব সংহত ছিল, যেমন দিল্লি, আগ্রা, ঢাকা, কাশী, মাদুরা প্রভৃতি জায়গা। এখানে সেরকম বোধ হল না। এখানে শিল্পকাজ কম-বেশি সর্বত্র ও সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়ানো। তার মানে, এখানকার লোক ধনীর ফরমাশে নয়, নিজের আনন্দেই নিজের চারদিককে সজ্জিত করে। কতকটা জাপানের মতো। তার কারণ, অল্প-পরিসর দ্বীপের মধ্যে আইডিয়া এবং বিদ্যা ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। তা ছাড়া এদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য। সেই সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়। দ্বীপ মাত্রের একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব এই যে, সেখানকার মানুষ সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে বহুকাল নিজের বিশেষ নৈপুণ্যকে অব্যাঘাতে ঘনীভূত করতে ও তাকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের অতিবিস্তৃত ভারতবর্ষে এক কালে যা প্রচুর হয়ে উৎপন্ন হয় অন্য কালে তা ছড়িয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমাদের দেশে অজন্তা আছে অজন্তার কালকেই আঁকড়ে; কনারক আছে কনারকেরই যুগে; তারা আর একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলে না। শুধু তাই নয়, তত্ত্বজ্ঞান ভারতীয় মনের প্রধান সম্পদ, কিন্তু বহু দূরে দূরে উপনিষদের বা শঙ্করাচার্যের কালে তা ভাগে ভাগে লগ্ন হয়ে রইল। একালে আমরা শুধু তাই নিয়ে আবৃত্তি করি কিন্তু তার সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েও এত শতাব্দী পরেও

ভারতবর্ষের এত জিনিস যে এখানে এখনো এমন করে আছে, তার কারণ, এটা দ্বীপ; এখানে সহজে কোনো জিনিস ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে না। অর্থ নষ্ট হতে পারে; একটার দ্বারা আর-একটা চাপা পড়তে পারে, কিন্তু বস্তুটা তবু থেকে যায়। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের অনেক জিনিসই এখানে আমরা বিশুদ্ধভাবে পাব বলে আশা করি। হয়তো এখানকার নাচ এবং নৃত্যমূলক অভিনয়টা সেই জাতের হতেও পারে। এখানকার রাজাদের বলে “আর্য’। আমার বিশ্বাস, তার অর্থ, রাজবংশ নিজেদের আর্যবংশীয় বলেই জানে, তারা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বজাতীয় ছিল না। তাই, এখানকার রাজাদের ঘরে যে-সকল কলা ও অনুষ্ঠান আজও চলে আসছে সেগুলি সন্ধান করলে এমন অনেক জিনিস পাওয়া যাবে যা আমাদের দেশে লুপ্ত ও বিস্মৃত।

এই ছোটো দ্বীপে এককালে অনেক রাজা ছিল, তাদের কেউ-কেউ ওলন্দাজ-আক্রমণে আসন্নপরাভবের আশঙ্কায় দলে দলে হাজার হাজার লোক নিঃশেষে আত্মহত্যা করে মরেছে। এখনো রাজোপাধিধারী যে কয়েকজন আছে তারা পুরোনো দামি শামাদানের মতো, যাতে বাতি আর জ্বলে না। তাদের প্রাসাদ ও সাজসজ্জা আছে, তা ছাড়া তারা যেখানে আছে তাকে নগর বলা চলে। কিন্তু, এই নগরে আর গ্রামে যে- পার্থক্য সে যেন ভাইবোনের পার্থক্যের মতো-তারা এক বাড়িতেই থাকে, তাদের মাঝে প্রাচীর নেই। আধুনিক ভারতে শিল্পচর্চা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছড়াছাড়ি। শহরগুলি যে দীপ জ্বালে তার আলো গ্রামে গিয়ে পড়েই না। দেশের সম্পত্তি যেন ভাগ হয়ে গেছে, গ্রামের অংশে যেটুকু পড়েছে তাতে আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই কারণে সমস্ত দেশ এক হয়ে কোনো শিল্প, কোনো বিদ্যাকে, রক্ষণ ও পোষণ করতে পারে না। তাই শহরের লোক যখন দেশের কথা ভাবে তখন শহরকেই দেশ বলে জানে; গ্রামের লোক দেশের কথা ভাবতেই জানে না। এই বালিতে আমরা মোটরে মোটরে দূরে দূরান্তরে যতই ভ্রমণ করি-নদী, গিরি, বন, শস্যক্ষেত্র ও পল্লীতে-শহরে মিলে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা দেখতে পাই; এখানকার সকল মানুষের মধ্যেই যেন এদের সকল সম্পদ ছড়ানো।

গামেলান-সংগীতের কথা পূর্বেই বলেছি। ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে। এরা-যে আপনমনে সহজ আনন্দে গান গায় না, তার কারণ এদের কণ্ঠসংগীতের অভাব। এরা টিং টিং টুং টাং করে যে-বাজনা বাজায় বস্তুত তাতে গান নেই, আছে তাল। নানা যন্ত্রে এরা তালেরই বোল দিয়ে চলে। এই বোল দেবার কোনো কোনো যন্ত্র ঢাক-ঢোলের মতোই, তাতে স্বর অল্প, শব্দই বেশি; কোনো কোনো যন্ত্র ধাতুতে তৈরি, সেগুলি স্বরবান। এই ধাতুযন্ত্রে টানা সুর থাকা সম্ভব নয়, থাকবার দরকার নেই, কেননা টানা সুর গানেরই জন্যে, বিছিন্ন সুরগুলিতে তালেরই বোল দেয়। আসলে এরা গান গায় গলা দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে; এদের নাচই যেন পদে পদে টানা সুরের মিড় দেওয়া–বিলিতি নাচের মতো ঝম্পবহুল নয়। অর্থাৎ এদের নাচ বর্ষার ঝমাঝম জলবিন্দুবৃষ্টির মতো নয়, ঝরনার তরঙ্গিত ধারার মতো। তাল যে- ঐক্যকে দেখায় সে হচ্ছে কালের অংশগুলিকে যোজনা ক'রে, গান যে-ঐক্যকে দেখায় সে হচ্ছে রসের অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণ ক'রে। তাই বলছি, এদের সংগীতই তাল, এদের নৃত্যই গান। আমাদের দেশে এবং য়ুরোপে গীতাভিনয় আছে, এদের দেশে নৃত্যাভিনয়।

ইতিমধ্যে এখানকার ওলন্দাজ রাজপুরুষ অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এদের একটা বিশেষত্ব আমার চোখে লাগল। অধীনস্থ জাতের উপর এদের প্রভুত্ব যথেষ্ট নেই, তা নয়, কিন্তু এদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করি নি। এখানকার লোকদের সঙ্গে এরা সহজে মেলামেশা করতে পারে। দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সর্বদাই হয় এবং সেই বিবাহের সন্তানেরা পিতৃকুল থেকে ভ্রষ্ট হয় না। এখানে অনেক উচ্চপদের ওলন্দাজ আছে যারা সংকরবর্ণ; তারা অবজ্ঞাভাজন নয়। এখানকার মানুষকে মানুষ জ্ঞান ক'রে এমন সহজ ব্যবহার কেমন করে সম্ভব হল, এই প্রশ্ন করাতে একজন ওলন্দাজ আমাকে বলেছিলেন, "যাদের অনেক সৈন্য, অনেক যুদ্ধজাহাজ, অনেক সম্পদ, অনেক সাম্রাজ্য, ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাদের মনে থাকে যে তারা একটা মস্ত-কিছু; এইজন্য ছোটো দরজা দিয়ে ঢুকতে তাদের অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়। নিজেদের সর্বদা তত প্রকাণ্ড বড়ো বলে জানবার অবসর আমাদের হয় নি। এইজন্যে সহজে সর্বত্র

আমরা ঢুকতে পারি; এইজন্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের পক্ষে সহজ।” ইতি

[৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭]

১২

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আজ বালিদ্বীপে আমাদের শেষ দিন। মুণ্ডুক বলে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাঙলায় আশ্রয় নিয়েছি। এতদিন বালির যে-অংশে ঘুরেছি সমস্তই চাষ-করা বাস-করা জায়গা; লোকালয়গুলি নারকেল, সুপারি, আম, তেঁতুল, সজনে গাছের ঘনশ্যামল বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এখানে এসে পাহাড়ের গা জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল। কতকটা শিলঙ পাহাড়ের মতো। নীচে স্তরবিন্যাস ধানের খেত; পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত। আকাশে অল্প একটু অস্পষ্টতার আবরণ, এখানকার পুরানো ইতিহাসের মতো। এখন শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু এমন রাত্রে আমাদের দেশের চাঁদ দিগঙ্গনাদের কাছে যেমন সম্পূর্ণ ধরা দেয় এখানে তা নয়; যে-ভাষা খুব ভালো করে জানি নে যেন সেইরকম তার জ্যোৎস্নাটি।

এতদিন এ দেশটা একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। আহূত রবাহূত বহু লোকের ভিড়। কত ফোটোগ্রাফওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কত ক্ষণিক-পরিব্রাজকের দল। পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ। মোটরের ধুলোয় এবং ধমকে আকাশ ম্লান। খেয়া-জাহাজ কাল জাভা অভিমুখে ফিরবে, তাই প্রতিবর্তী যাত্রীর দল আজ নানা পথ বিপথ দিয়ে চঞ্চল হয়ে ধাবমান। এত সমারোহ কেন, সে- কথা জিজ্ঞাসা করতে পার।

বালির লোকেরা যারা হিন্দু, যারা নিজের ধর্মকে আগম বলে, শ্রাদ্ধক্রিয়া তাদের কাছে একটা খুব বড়ো উৎসব। কেননা,যথানিয়মে মৃতের সৎকার হলে তার আত্মা কুয়াশা

হয়ে পৃথিবীতে এসে পুনর্জন্ম নেয়; তার পর বারে বারে সংস্কার পেতে পেতে শেষকালে শিবলোকে চরম মোক্ষে তার উদ্ধার।

এবারে আমরা যাঁদের শ্রাদ্ধে এসেছি তাঁরা দেবত্ব পেয়েছেন বলে আত্মীয়েরা স্থির করেছে, তাই এত বেশি ঘটা। এত ঘটা অনেক বৎসর হয় নি, আর কখনো হবে কিনা সকলে সন্দেহ করছে। কেননা, আধুনিক কাল তার কাটারি হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব করবার জন্যে; তার একমাত্র উৎসাহ উপকরণবাহুল্যের দিকে।

এখানকার লোকে বলছে, সমারোহে খরচ হবে এখানকার টাকায় প্রায় চল্লিশ হাজার, আমাদের টাকায় পঞ্চাশ হাজার। ব্যয়ের এই পরিমাণটা সকলেরই কাছে অত্যন্ত বেশি বলেই ঠেকছে। আমাদের দেশে বড়ো লোকের শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ হচ্ছে, আমাদের শ্রাদ্ধের খরচ ঘটা করবার জন্যে তেমন নয় যেমন পুণ্য করবার জন্যে। তার প্রধান অঙ্গই দান, পরলোকগত আত্মার কল্যাণকামনায়। এখানকার শ্রাদ্ধেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অর্ঘ্য ও আহার্য দান যে নেই তা নয়, কিন্তু এর সব চেয়ে ব্যয়সাধ্য অংশ সাজসজ্জা। সে-সমস্তই চিতায় পুড়ে ছাই হয়। এই দেহকে নষ্ট করে ফেলতে এদের আন্তরিক অনুমোদন নেই, সেটা সেদিনকার অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপারে বোঝা যায়। কালো গোরুর মূর্তি, তার পেটের মধ্যে মৃতদেহ, রাস্তা দিয়ে এটাকে যখন বহন করে নিয়ে যায় তখন শোভাযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। যেন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেন অনিচ্ছা। বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়। এইখানেই আগম অর্থাৎ যে-ধর্ম বাইরে থেকে এসেছে তার সঙ্গে এদের নিজের হৃদয়বৃত্তির বিরোধ। আগমেরই হল জিত, দেহ হল ছাই।

উবুদ বলে জায়গার রাজার ঘরে এই অনুষ্ঠান। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে সুনীতির পরিচয় পেলেন সুনীতিকে জানালেন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে এ দেশে পুনর্বার হবার সম্ভাবনা খুব বিরল; অতএব, এই অনুষ্ঠানে সুনীতি যদি যথারীতি শ্রাদ্ধের বেদমন্ত্র পাঠ করেন তবে তিনি তৃপ্ত হবেন। সুনীতি ব্রাহ্মণসজ্জায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে

“মধুবাতা ঋতায়ন্তে” এবং কঠোপনিষদের শ্লোক প্রভৃতি উচ্চারণ করে শুভকর্ম সম্পন্ন করেন। বহুশত বৎসর পূর্বে একদিন বেদমন্ত্রগানের সঙ্গে এই দ্বীপে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, বহুশত বৎসর পরে এখানকার শ্রাদ্ধে সেই মন্ত্র হয়তো বা শেষবার ধ্বনিত হল। মাঝখানে কত বিস্মৃতি, কত বিকৃতি। রাজা সুনীতিকে পৌরোহিত্যের সম্মানের জন্যে কী দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুনীতি বলেছিলেন, এই কাজের জন্যে অর্থগ্রহণ তাঁর ব্রাহ্মণবংশের রীতিবিরুদ্ধ। রাজা তাঁকে কর্ম-অন্তে বালির তৈরি মহার্ঘ বস্ত্র ও আসন দান করেছিলেন।

এখানে একটা নিয়ম আছে যে, গৃহস্থের ঘরে এমন কারো যদি মৃত্যু হয় যার জ্যেষ্ঠরা বর্তমান তা হলে সেই গুরুজনদের মৃত্যু না হলে এর আর সৎকার হবার জো নেই। এইজন্যে বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহকে রেখে দিতে হয়। তাই অনেকগুলি দেহের দাহক্রিয়া এখানে একসঙ্গে ঘটে। মৃতকে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

সৎকারের দীর্ঘকাল অপেক্ষার আরো একটা কারণ, সৎকারের উপকরণ ও ব্যয়বাহুল্য। তার জন্যে প্রস্তুত হতে দেরি হয়ে যায়। তাই শুনেছি, এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে, তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

শবাধার বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেকসংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ুরপংখি যেমন ময়ূরের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ; তার দুই-ধারে বিস্তীর্ণ মস্ত দুই পাখা, সুন্দর করে তৈরি। শিল্পনৈপুণ্যে বিস্মিত হতে হয়। শ্রাদ্ধের এই নানাবিধ উপকরণের আয়োজন মনের ভিতরে সবটা গ্রহণ করা বড়ো কঠিন; যেটা সব চেয়ে দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে সে হচ্ছে জনতার অবিশ্রাম ধারা। বহু দূর ও নানা দিক থেকে মেয়েরা মাথায় কতরকমের অর্ঘ্য বহন করে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে। দূরে দূরে, গ্রামে গ্রামে, যেখানে অর্ঘ্য-মাথায় বাহকেরা যাত্রা করতে প্রস্তুত, সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায়

গামেলান বাজিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র উৎসব চলছে। সর্বসাধারণে মিলে দলে দলে এই অনুষ্ঠানের জন্যে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা করে দিচ্ছে। অর্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন করে আনা নয়, সমস্ত বহু যত্নে সুসজ্জিত। সেদিন দেখলুম, ইয়াং-ইয়াং বলে এক শহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তাঁর উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তাঁর প্রাসাদের পুরনারীরা। কী শোভা, কী সজ্জা, কী আভিজাত্যের বিনয়সৌন্দর্য! এমনি করে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণবিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না।

সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয়, এইরকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দমিলনটি কী কল্যাণময়। এই মিলন কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র সুন্দর অবয়ব। নানা গ্রামে, নানা ঘরে, এই উৎসবমূর্তিকে অনেক দিন থেকে নানা মানুষে বসে বসে নিজের হাতে সুসম্পূর্ণ করে তুলেছে। এ হচ্ছে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত সৃষ্টি যেমন ক'রে এরা নানা লোক ব' সে, নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে, সুর মিলিয়ে, একটা সচল ধ্বনিমূর্তি তৈরি করে তুলতে থাকে। কোথাও অনাদর নেই, কুশ্রীতা নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেল না। জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের সৃষ্টি হয় নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি; যেখানে বিরোধ ঠেকাবার জন্যে পুলিশবিভাগের লাল পাগড়ি সেখানে নয়; যেখানে অন্তরের আনন্দে মানুষের মিলন কেবল-যে নিরাময় নিরাপদ তা নয়, আপনা-আপনি ভিতরের থেকে সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সেইখানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিসটিকে এমনই সুসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা করি নিজের দেশে। কিন্তু, এই ছোটো দ্বীপের রাস্তার ধারে যে-ব্যাপারটিকে দেখা গেল সে কি সহজ কথা। কত কালের সাধনায়, ভিতরের কত গ্রন্থি মোচন ক'রে তবে এইটুকু জিনিস সহজ হয়। জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত। সেই ঐক্যকে সকলের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সুন্দর করে তোলা কতই শক্তিসাধ্য। আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হয়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে নানা মূর্তিতে নানা

উপলক্ষে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন-আপন ইচ্ছার, আপন-আপন শক্তির, যোগদান করতে থাকলে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচাগুলো ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায়, ঝরনার জল ক্রমাগত বইতে থাকলে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হয়ে আসে। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন, সাধনায় জ্ঞান ও কর্মই যথেষ্ট। কিন্তু, বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা-কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনই প্রাণ আসে; তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়; সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

বেলা আটটা বাজল। বারান্দার সামনের গোটা-দুইতিন মোটরগাড়ি জমা হয়েছে। সুরেনে সুনীতিতে মিলে নানা আয়তনের বাক্সে ব্যাগে ঝুলিতে থলিতে গাড়ি বোঝাই করছেন। তাঁরা একদল আগে থাকতেই খেয়াঘাটের দিকে রওনা হবার অভিমুখী। নিকটের পাহাড়ের ঘনসবুজ অরণ্যের ‘পরে রৌদ্র পড়েছে; দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত। দক্ষিণ শৈলতটের সমুদ্রখণ্ডটি নিশ্বাসের-ভাপ-লাগা আয়নার মতো ম্লান। ওই কাছেই গিরিবক্ষসংলগ্ন পল্লীটির বনবেষ্টনের মধ্যে সুপুরি গাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুলছে। ঝরনা থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল বয়ে আনছে। নীচে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপারে, সামনের পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়। নারকেলগাছগুলি মেঘমুক্ত আকাশের দিকে পাতার অঞ্জলি তুলে ধরে সূর্যালোক পান করছে।

এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে মনে মনে ভাবছি, দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভালো, তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁছচ্ছে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েছি বলেই যে এমন হয় তা নয়; ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আলোতে, নদীতে প্রান্তরে, প্রকৃতির একটি উদারতা দেখেছি; চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেছে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্তি চারিদিকে; তবুও সমস্তকে

অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদি কালের যে-কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা, যত বেশি এমন আর কোথাও দেখি নি; তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। অতি দূরকালের তপোবনের ওঙ্কারধ্বনি এখনো সেখানকার আকাশে যেন নিত্য-নিশ্বসিত। তাই, আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তার আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত করে রয়েছে। ইতি।

[৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭]

পুনশ্চঃ দ্রুত চলতে চলতে উপরে উপরে যে-ছবি চোখে জাগল, যে-ভাব মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল, তাই লিখে দিয়েছি, কিন্তু তাই বলে এটাকে বালির প্রকৃত বিবরণ বলে গণ্য করা চলবে না। এই ছবিটিকে হয়তো উপরকার আবরণের জরি বলাও চলে। কিন্তু উপরের আবরণে ভিতরের ভাবের ছাপ নিত্যই পড়ে তো। অতএব, আবরণটিকে মানুষের পরিচয় নয় বলে উপেক্ষা করা যায় না। যে-আবরণ কৃত্রিম ছদ্মবেশের মতো সত্যকে উপর থেকে চাপা দেয় সেইটেতেই প্রতারণা করে, কিন্তু যে-আবরণ চঞ্চল জীবনের প্রতি মুহূর্তের ওঠায়-পড়ায়, বাঁকায়-চোরায়, দোলায়-কাঁপনে, আপনা-আপনি একটা চেহারা পায় মোটের উপর তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখানকার ঘরে মন্দিরে, বেশে ভূষায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে, সব- প্রথমেই যেটা খুব করে মনে আসে সেটা হচ্ছে সমস্ত জাতটার মনে শিল্পরচনায় স্বাভাবিক উদ্যম। একজন পাশ্চাত্য আর্টিস্ট এখানে তিন বৎসর আছেন; তিনি বলেন, এদের শিল্পকলা থেমে নেই, সে আপন বেগে আপন পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সে-সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত এখানে চীনেদের প্রভাব ছিল, দেখতে দেখতে সেটা আপনি ক্ষয়ে আসছে, বালির চিত্ত আপন ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতে বসেছে। তার কাজে এমন অনায়াস প্রতিভা আছে যে, আধুনিক যে দুই-একটি মূর্তি তিনি দেখেছেন সেগুলি য়ুরোপের শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চমকে উঠবে এই তাঁর বিশ্বাস। এই তো গেল

রূপ-উদ্ভাবন করবার এদের স্বাভাবিক শক্তি। তার পরে, এই শক্তিটিই এদের সমাজকে মূর্তি দিচ্ছে। এরা উৎসবে অনুষ্ঠানে নানা প্রণালীতে সেই রূপ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত। যেখানে এই সৃষ্টির উদ্যম নিয়ত সচেষ্ট সেখানে সমস্ত দেশের মুখে একটি শ্রী ও আনন্দ ব্যক্ত হয়। অথচ, জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে-মেয়ে বন্ধ্যা প্রেতলোকে গলায় দড়ি বেঁধে তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়, এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে, এক পুত্র, এক কন্যা, তা হলে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন করে সে শ্মশানে যায়; পরিবারের লোক যমজ সন্তান তার পিছন-পিছন বহন করে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনোরকম করে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধরে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপক্ষালনের উদ্দেশে নানাবিধ পূজার্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়, সেই কয়দিন তার সঙ্গে সকলরকম ব্যবহার বন্ধ। এই সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে করে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বাঁচায় যেখানে তার চর্চা নেই, তার প্রতি বিশ্বাস নেই, সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে। তবুও এইগুলোকেই প্রধান করে দেখবার নয়। জ্যোতির্বিদের কাছে সূর্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না, তবু সাধারণ লোকের কাছে তার আলোটাই যথেষ্ট। সূর্যকে কলঙ্কী বললে মিথ্যা বলা হয় না, তবুও সূর্যকে জ্যোতির্ময় বললেই সত্য বলা হয়। তথ্যের ফর্দ লম্বা করা যে-সব বৈজ্ঞানিকের কাজ তাঁরা পশুসংসারে হিংস্র দাঁতনখের ভীষণতার উপর কলমের ঝোঁক দেবামাত্র কল্পনায় মনে হয়, পশুদের জীবনযাত্রা কেবল ভয়েরই বাহন। কিন্তু, এই-সব অত্যাচারের চেয়ে বড়ো হচ্ছে সেই প্রাণ যা আপনার সদাসক্রিয় উদ্যমে আপনাতেই আনন্দিত, এমন কি, শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ও চেষ্টা সেও এই আনন্দিত প্রাণক্রিয়ারই অংশ। ইণ্টার-ওসেন্ নামক যে- মাসিকপত্রে একজন লেখকের বর্ণনা থেকে বালির মেয়েদের

দুঃখের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, সেই কাগজেই আর-একজন লেখক সেখানকার শিল্পকুশল উৎসববিলাসী সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর সেই দেখার আলোতে বোঝা যায়, গ্লানির কলঙ্কটা অসত্য না হলেও সত্যও নয়। এই দ্বীপে আমরা অনেক ঘুরেছি; গ্রামে পথে বাজারে শস্যক্ষেত্রে মন্দিরদ্বারে উৎসবভূমিতে ঝরনাতলায় বালির মেয়েদের অনেক দেখেছি; সব জায়গাতেই তাদের দেখলুম সুস্থ, সুপরিপুষ্ট, সুবিনীত, সুপ্রসন্ন-তাদের মধ্যে পীড়া অপমান অত্যাচারের কোনো চেহারা তো দেখলুম না। খুঁটিয়ে খবর নিলে নিশ্চয় কলঙ্কের কথা অনেক পাওয়া যাবে; কিন্তু খুঁটিয়ে-পাওয়া ময়লা কথাগুলো সুতো দিয়ে এক সঙ্গে গাঁথলেই সত্যকে স্পষ্ট করা হবে, এ কথা বিশ্বাস করবার নয়। ইতি

[সুরবায়া। জাভা। ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত]

১৩

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বালি থেকে পার হয়ে জাভা দ্বীপে সুরবায়া শহরে এসে নামা গেল। এই জায়গাটা হচ্ছে বিদেশী সওদাগরদের প্রধান আখড়া। জাভার সব চেয়ে বড়ো উৎপন্ন জিনিস চিনি, এই ছোটো দ্বীপটি থেকে দেশবিদেশে চালান যাচ্ছে। এমন এক কাল ছিল, পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিল ভারতবর্ষের। আজ এই জাভার হাট থেকে চিনি কিনে বৌবাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ তৈরি হয়। ধরণী স্বভাবত কী দান করেন আজকাল তারই উপরে ভরসা রাখতে গেলে ঠকতে হয়, মানুষ কী আদায় ক'রে নিতে পারে এইটেই হল আসল কথা। গোরু আপনা-আপনি যে-দুধটুকু দেয় তাতে যজ্ঞের আয়োজন চলে না, গৃহস্থের শিশুদের পেট ভরিয়ে বৌবাজারের দোকানে গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই কেঁড়ে শূন্য হয়ে যায়। যারা ওস্তাদ গোয়ালা তারা জানে কিরকম খোরাকি ও প্রজননবিধির দ্বারা গোরুর দুধ বাড়ানো চলে। এই শ্যামল দ্বীপটি ওলন্দাজদের পক্ষে ধরণী-কামধেনুর দুধভরা বাঁটের মতো। তারা জানে, কোন্ প্রণালীতে এই বাঁট কোনোদিন একফোঁটা শুকিয়ে না যায়, নিয়ত দুধে ভরে থাকে; সম্পূর্ণ দুইয়ে-নেবার কৌশলটাও তাদের আয়ত্ত। আমাদের কর্তৃপক্ষও তাঁদের গোয়ালবাড়ি ভারতবর্ষে বসিয়েছেন, চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুলজার হল; কিন্তু, এদিকে আমাদের চাষের খেত নির্জীব হয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে পড়ল চাষিদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েছে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন বসেছে, তার রিপোর্টও বেরোবে। দরিদ্রের চাকাভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে নড়ে উঠবে কি না জানি নে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে মজুরি মিলতে তাদের অসুবিধে হবে না। মোট কথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েছে; তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছে, কর্তৃপক্ষেরও ব্যাবসা চলছে ভালো। এর মধ্যে তত্ত্বটা হচ্ছে এই

যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস ব্যবহার করব, এটা ভলো কথা; কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস-উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে, এটা হল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার; সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান্ রক্ষা হবে।

সুরবায়াতে তিন দিন আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেম তিনি সুরকর্তার রাজবংশের একজন প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু তিনি আপন অধিকার ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করে এই শহরে এসে বাণিজ্য করছেন। চিনি রপ্তানির কারবার; তাতে তাঁর প্রভূত মুনফা। চমৎকার মানুষটি, প্রাচীন অভিজাতকুলযোগ্য মর্যাদা ও সৌজন্যের অবতার। তাঁর ছেলে আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; বিনীত, নম্র, প্রিয়দর্শন-তাঁরই উপরে আমাদের অতিথিপরিচর্যার ভার। বড়ো ভয় ছিল, পাছে অবিশ্রাম অভ্যর্থনার পীড়নে আরাম-অবকাশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেম। তাঁদের প্রাসাদের এক অংশ সম্পূর্ণ আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিরালায় ছিলেম, ত্রুটিবিহীন আতিথ্যের পনেরো-আনা অংশ ছিল নেপথ্যে। কেবল আহারের সময়েই আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ। মনে হত, আমিই গৃহকর্তা, তাঁরা উপলক্ষ মাত্র। সমাদরের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস ছিল স্বাধীনতা ও অবকাশ।

এখানে একটি কলাসভা আছে। সেটা মুখ্যত য়ুরোপীয়। এখানকার সওদাগরদের ক্লাবের মতো। কলকাতায় যেমন সংগীতসভা এও তেমনি। কলকাতার সভায় সংগীতের অধিকার যতখানি এখানে কল্যাবিদ্যার অধিকার তার চেয়ে বেশি নয়। এইখানে আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আমার প্রতি অনুরোধ ছিল; যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলেছি। একদিন আমাদের গৃহকর্তার বাড়িতে অনেকগুলি এদেশীয় প্রধান ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার কাজ। সুনীতিও একদিন তাঁদের সভায় বক্তৃতা করে এসেছেন; সকলের ভালো লেগেছে।

এখানকার ভারতীয়েরাও একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে এখানকার রাজপুরুষ ও অন্য অনেককে নিমন্ত্রণ ক'রে চা খাইয়েছিলেন। সেদিন আমি কিছু দক্ষিণাও পেয়েছি। এইভাবে এখানে কেটে গেল, একেবারে এঁদের বাড়ির ভিতরেই। আঙিনায় অনেকগুলি গাছ ও লতাবিতান। আমগাছ, সপেটা, আতা। যে-জাতের আম তাকে এরা বলে মধু, এদের মতে বিশেষভাবে স্বাদু। এবার যথেষ্ট বৃষ্টি হয় নি বলে আমগুলো কাঁচা অবস্থাতেই ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এখানে ভোজনকালে যে-আম খেতে পেয়েছি দেশে থাকলে সে-আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর কেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর বলে স্থির করতুম, কিন্তু এখানে তার আদরের ত্রুটি হয় নি।

এই আঙিনায় লতামণ্ডপের ছায়ায় আমাদের গৃহকর্ত্রী প্রায়ই বেলা কাটান। চারদিকে শিশুরা গোলমাল করছে, খেলা করছে-সঙ্গে তাদের বুড়ি ধাত্রীরা। মেয়েরা যেখানে-সেখানে বসে কাপড়ের উপর এদেশে-প্রচলিত সুন্দর বাতির ছাপ-দেওয়া কাজে নিযুক্ত। গৃহকর্মের নানা প্রবাহ এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত প্রাঙ্গণের চারদিকে আবর্তিত।

পরশু সুরবায়া থেকে দীর্ঘ রেলপথ ও রৌদ্রতাপক্লিষ্ট অপরাহ্নের ছ'টি ঘণ্টা কাটিয়ে তিনটের সময় সুরকর্তায় পৌঁচেছি। জাভার সব চেয়ে বড়ো রাজপরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু প্রতিপত্তি কাড়তে পারে নি। এই বংশেরই একটি পরিবারের বাড়িতে আছি। তাঁদের উপাধি মঙ্কুনগরো; এঁদেরই এক শাখা সুরবায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

প্রাসাদের একটি নিভৃত অংশ আমরাই অধিকার করে আছি। এখানে স্থান প্রচুর, আরামের উপকরণ যথেষ্ট, আতিথ্যের উপদ্রব নেই। রাজবাড়ি বহুবিস্তীর্ণ, বহুবিভক্ত। আমরা যেখানে আছি তার প্রকাণ্ড একটি অলিন্দ, সাদা মার্বল পাথরে বাঁধানো, সারি সারি কাঠের থামের উপরে ঢালু কাঠের ছাদ। এই রাজপরিবারের বর্ণলাঞ্ছন হচ্ছে সবুজ ও হলদে, তাই এই অলিন্দের থাম ও ছাদ সবুজে সোনালিতে চিত্রিত। অলিন্দের এক ধারে গামেলান-সংগীতের যন্ত্র সাজানো। বৈচিত্র্যেও কম নয়, সংখ্যাতেও অনেক। সাত সুরের

ও পাঁচ সুরের ধাতুফলকের যন্ত্র অনেক রকমের, অনেক আয়তনের, হাতুড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। ঢোলের আকার ঠিক আমাদের দেশেরই মতো, বাজাবার বোল ও কায়দা অনেকটা সেই ধরনের। এ ছাড়া বাঁশি, আর ধনু দিয়ে বাজাবার তাঁতের যন্ত্র।

রাজা স্টেশনে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় একত্র আহারের সময় তাঁর সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল। অল্প বয়স, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখশ্রী। ডাচ্ ভাষায় আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; ইংরেজি অল্প অল্প বলতে ও বুঝতে পারেন। খেতে বসবার আগে বারান্দার প্রান্তে বাজনা বেজে উঠল, সেই সঙ্গে এখানকার গানও শোনা গেল। সে-গানে আমাদের মতো আস্থায়ী-অন্তরার বিভাগ নেই। একই ধুয়ো বারবার আবৃত্তি করা হয়, বৈচিত্র্য যা-কিছু তা যন্ত্র বাজনায়। পূর্বের চিঠিতেই বলেছি, এদের যন্ত্রবাজনাটা তাল দেবার উদ্দেশে। আমাদের দেশে বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তালের যন্ত্র যে-সপ্তকে গান ধরা হয় তারই সা সুরে বাঁধা; এখানকার তালের যন্ত্রে গানের সব সুরগুলিই আছে। মনে করো, “তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী” ভৈরবীর এই এক ছত্র মাত্র কেউ যদি ফিরে ফিরে গাইতে থাকে আর নানাবিধ যন্ত্রে ভৈরবীর সুরেই যদি তালের বোল দেওয়া হয়, আর সেই বোল-যোগেই যদি ভৈরবী রাগিণীর ব্যাখ্যা চলে তা হলে যেমন হয় এও সেইরকম। পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে, শুনতে ভালোই লাগে, নানা আওয়াজের ধাতুবাদ্যে সুরের নৃত্যে আসর খুব জমে ওঠে।

খেয়ে এসে আবার আমরা বারান্দায় বসলুম। নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্পকুণ্ডলী বালা, বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্দ-তাকে এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায়-সবুজে-মেলানো আঁট কাঁচুলি; কোমরবন্দ থেকে দুই ধারার বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতোই বস্ত্রবেষ্টনী, সুন্দর বর্তিকশিল্পে বিচিত্র; দেখবামাত্রই মনে হয়, অজন্তার ছবিটি। এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখি নি।

আমাদের নর্তকী বাইজিদের আঁটপায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমাকে ভারি কুশ্রী লেগেছে! তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারী দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়, সাজানো একটা মস্ত বোঝা। তার পরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া, ভুরু ও চোখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কারজনক বলে বোধ হয়–নীতির দিক থেকে নয়, রীতির দিক থেকে। জাপানে ও জাভাতে যে-নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য যেমন তার শালীনতাও তেমনি নিখুঁত। আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনু দেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।

শুনেছি, অনেক য়ুরোপীয় দর্শক এই নাচের অতিমৃদুতা ও সৌকুমার্য ভালোই বাসে না। তারা উগ্র মাদকতায় অভ্যস্ত বলে এই নাচকে একঘেয়ে মনে করে। আমি তো এ নাচে বৈচিত্র্যের একটু অভাব দেখলুম না; সেটা অতিপ্রকট নয় বলেই যদি চোখে না পড়ে তবে চোখেরই অভ্যাসদোষ। কেবলই আমার এই মনে হচ্ছিল যে, এ হচ্ছে কলাসৌন্দর্যের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি, উপাদানরূপে মানুষটি তার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে। নাচ হয়ে গেলে এরা যখন বাজিয়েদের মধ্যে এসে বসল তখন তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তখন দেখতে পাওয়া যায়, তারা গায়ে রঙ করেছে, কপালে চিত্র করেছে, শরীরের অতিস্ফূর্তিকে নিরস্ত করে দিয়ে একটি নিবিড় সৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট করে কাপড় পরেছে–সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সমস্তই অসংগত, এতে চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু, সাধারণ মানুষের এই রূপান্তর নৃত্যকলায় অপরূপই হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে আমরা প্রাসাদের অন্যান্য বিভাগে ও অন্তঃপুরে আহূত হয়েছিলেম। সেখানে স্তম্ভশ্রেণীবিধৃত অতি বৃহৎ একটি সভামণ্ডপ দেখা গেল; তার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য দেখে ভারি আনন্দ পেলুম। এ-সমস্তর উপযুক্ত বিবরণ তোমরা নিশ্চয় সুরেন্দ্রের চিঠি ও চিত্র থেকে পাবে। অন্তঃপুরে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি মণ্ডপে গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের গৃহকর্তা ও গৃহস্বামিনী বসে আছেন। রানীকে ঠিক যেন একজন সুন্দরী বাঙালী মেয়ের মতো দেখতে; বড়ো বড়ো চোখ, স্নিগ্ধ হাসি, সংযত

সৌষম্যের মর্যাদা ভারি তৃপ্তিকর। মণ্ডপের বাইরে গাছপালা, আর নানারকম খাঁচায় নানা পাখি। মণ্ডপের ভিতরে গানবাজনার, ছায়াভিনয়ের, মুখোষের অভিনয়ের, পুতুলনাচের নানা সরঞ্জাম। একটা টেবিলে বর্তিক শিল্পের অনেকগুলি কাপড় সাজানো। তার মধ্যে থেকে আমাকে তিনটি কাপড় পছন্দ করে নিতে অনুরোধ করলেন। সেই সঙ্গে আমার দলের প্রত্যেককে একটি একটি করে এই মূল্যবান কাপড় দান করলেন। কাপড়ের উপর এইরকম শিল্পকাজ করতে দু-তিন মাস করে লাগে। রাজবাড়ির পরিচারিকারাই এই কাজে সুনিপুণ।

এই রাজবংশীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিবারের যাঁরা, কাল রাত্রে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর ওখানে রাজকায়দার যতরকমের উপসর্গ। যেমন, দুই সারস পাখি পরস্পরকে ঘিরে ঘিরে নানা গম্ভীর ভঙ্গীতে নাচে দেখেছি, এখানকার রেসিডেন্ট্ আর এই রাজা পরস্পরকে নিয়ে সেইরকম রাজকীয় চাল বিস্তার করতে লাগলেন। রাজা কিম্বা রাজপুরুষদের একটা পদোচিত মর্যাদা বাইরের দিক থেকে রক্ষা করে চলতে হয়, মানি; তাতে সেই-সব মানুষের সামান্যতা কিছু ঢাকাও পড়ে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে তাতে তাদের সাধারণতাকেই হাস্যকরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়।

কাল রাত্রে যে-নাচ হল সে ন'জন মেয়েতে মিলে। তাতে যেমন নৈপুণ্য তেমনি সৌন্দর্য, কিন্তু দেখে মনে হল, কাল রাত্রের সেই নাচে স্বত-উচ্ছ্বসিত প্রাণের উৎসাহ ছিল না; যেন এরা ক্লান্ত, কেবল অভ্যাসের জোরে নেচে যাচ্ছে। কালকের নাচে গুণপনা যথেষ্ট ছিল কিন্তু তেমন ক'রে মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। রাজার একটি ছেলে পাশে বসে আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তাঁকে আমার বড়ো ভালো লাগল। অল্প বয়স, দুই বছর হল্যাণ্ডে শিক্ষা পেয়েছেন, ওলন্দাজ গবর্নমেণ্টের সৈনিকবিভাগে প্রধান পদে নিযুক্ত। তাঁর চেহারায় ও ব্যবহারে স্বাভাবিক আকর্ষণীশক্তি আছে।

কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্বরাত্রে যে-দুজন বালিকা নেচেছিল তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোষ পরে সঙের নাচ নাচলে।

আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে, এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবেভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরোমাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোষের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হল না। বেশভূষার সৌন্দর্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও- যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে, এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকল। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকেও বিরূপ করতে পারে না; এদের রাক্ষসেরাও নাচে। ইতি।

[সুরকর্তা। জাভা। ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। শ্রীমতী প্রতিমাদেবীকে লিখিত]

১৪

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, শেষ চিঠিতে তোমাকে এখানকার নাচের কথা লিখেছিলুম, ভেবেছিলুম নাচ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়ে গেল। এমন সময়ে সেই রাত্রে আর-এক নাচের বৈঠকে ডাক পড়ল। সেই অতিপ্রকাণ্ড মণ্ডপে আসর; বহুবিস্তীর্ণ শ্বেত পাথরের ভিত্তিতলে বিদ্যুদ্দীপের আলো ঝল্‌মল্‌ করছে। আহারে বসবার আগে নাচের একটা পালা আরম্ভ হল–পুরুষের নাচ, বিষয়টা হচ্ছে, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের লড়াই। এখানকার রাজার ভাই ইন্দ্রজিত সেজেছেন; ইনি নৃত্যবিদ্যায় ওস্তাদ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় ইনি নাচ শিখতে আরম্ভ করেছেন। অল্প বয়সে সমস্ত শরীরটা যখন নম্র থাকে, হাড় যখন পাকে নি, সেই সময়ে এই নাচ শিক্ষা করা দরকার; দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি যাতে অতি সহজে সরে, প্রত্যেক মাংসপেশিতে যাতে অনায়াসে জোর পৌঁছয়, এমন অভ্যাস করা চাই। কিন্তু, নাচ সম্বন্ধে রাজার ভাইয়ের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকাতে তাঁকে বেশি চেষ্টা করতে হয় নি।

হনুমান বনের জন্তু, ইন্দ্রজিত সুশিক্ষিত রাক্ষস, দুই জনের নাচের ভঙ্গীতে সেই ভাবের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেওয়া চাই, নইলে রসভঙ্গ হয়। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এদের সাজ। সাধারণত আমাদের যাত্রায় নাটকে হনুমানের হনুমানত্ব খুব বেশি করে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের কৌতুক উদ্রেক করবার চেষ্টা হয়। এখানে হনুমানের আভাসটুকু দেওয়াতে তার মনুষ্যত্ব আরো বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। হনুমানের নাচে লম্ফ-ঝম্প দ্বারা তার বানরস্বভাব প্রকাশ করা কিছুই কঠিন হত না, আর সেই উপায়ে সমস্ত সভা অনায়াসেই অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠত, কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে হনুমানকে মহত্ত্ব দেওয়া। বাংলাদেশের অভিনয় প্রভৃতি দেখলে বোঝা যায় যে, হনুমানের বীরত্ব, তার

একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মত্যাগের চেয়ে-তার লেজের দৈর্ঘ্য, তার পোড়ামুখের ভঙ্গিমা, তার বানরত্বই বাঙালির মনকে বেশি করে অধিকার করেছে। আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে তার উলটো। এমন কি, হনুমানপ্রসাদ নাম রাখতে বাপমায়ের দ্বিধা বোধ হয় না। বাংলায় হনুমানচন্দ্র বা হনুমানেন্দ্র আমরা কল্পনা করতে পারি নে। এ দেশের লোকেরাও রামায়ণের হনুমানের বড়ো দিকটাই দেখে। নাচে হনুমানের রূপ দেখলুম-পিঠ বেয়ে মাথা পর্যন্ত লেজ, কিন্তু এমন একটা শোভনভঙ্গী যে দেখে হাসি পাবার জো নেই। আর-সমস্তই মানুষের মতো। মুকুট থেকে পা পর্যন্ত ইন্দ্রজিতের সাজসজ্জা একটি সুন্দর ছবি। তার পরে দুই জনে নাচতে নাচতে লড়াই; সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে-ঢোলে কাঁসরে-ঘণ্টায় নানাবিধ যন্ত্রে ও মাঝে মাঝে বহু মানুষের কণ্ঠের গর্জনে সংগীত খুব গম্ভীর প্রবল ও প্রমত্ত হয়ে উঠছে। অথচ, সে সংগীত শ্রুতিকটু একটুও নয়; বহুযন্ত্র- সম্মিলনের সুশ্রাব্য নৈপুণ্য তার উদ্দামতার সঙ্গে চমৎকার সম্মিলিত।

নাচ, সে বড়ো আশ্চর্য। তাতে যেমন পৌরুষ সৌন্দর্যও তেমনি। লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব-অভিনয়ে নাচের প্রকৃতি একটুমাত্র এলোমেলো হয়ে যায় নি। আমাদের দেশের স্টেজে রাজপুত বীরপুরুষের বীরত্ব যেরকম নিতান্ত খেলো এ তা একেবারেই নয়। প্রত্যেক ভঙ্গীতে ভারি একটা মর্যাদা আছে। গদাযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, মুষলের আঘাত, সমস্তই ত্রুটিমাত্রবিহীন নাচে ফুটে উঠেছে। সমস্তর মধ্যে অপূর্ব একটি শ্রী অথচ দৃপ্ত পৌরুষের আলোড়ন। এর আগে এখানে মেয়েদের নাচ দেখেছি, দেখে মুগ্ধও হয়েছি, কিন্তু এই পুরুষের নাচের তুলনায় তাকে ক্ষীণ বোধ হল। এর স্বাদ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যখন ধ্রুপদের নেশায় পেয়ে বসে তখন টপ্পার নিছক মিষ্টতা হালকা বোধ হয়, এও সেইরকম।

আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা আর-একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়ে দুজনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জুন আর সুবলের যুদ্ধ। গল্পটা হয়তো মহাভারতে আছে কিন্তু আমার তো মনে পড়ল না। ব্যাপারটা হচ্ছে-কোন্-এক বাগানে অর্জুনের অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্র চুরি করেছে সুবল, সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অর্জুনকে

মারবার জন্যে। অর্জুন ছিল বাগানের মালী-বেশে। খানিকটা কথাবার্তার পরে দুজনের লড়াই। সুবলের কাছে বলরামের লাঙল অস্ত্রটা ছিল। যুদ্ধ করতে করতে অর্জুন সেটা কেড়ে নিয়ে তবে সুবলকে মারতে পারলে।

নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ, যারা নাচছে তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কী সেইটেই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা। মনে করো না–বাঘ নয়, সিংহ নয়, জবাফুলে ধুতরাফুলে সাংঘাতিক হানাহানি, ডাঁটায় ডাঁটায় সংঘর্ষ, পাপড়িগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন; এদিকে বনসভা কাঁপিয়ে বৈশাখী ঝড়ের গামেলান বাজছে, গুরুগুরু মেঘের মৃদঙ্গ, গাছের ডালে ডালে ঠকাঠকি, আর সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের বাঁশি।

সব-শেষে এলেন রাজার ভাই। এবার তিনি একলা নাচলেন। তিনি ঘটোৎকচ। হাস্যরসিক বাঙালি হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি করে এসেছে। এখানকার লোকচিত্তে ঘটোৎকচের খুব আদর। সেইজন্যেই মহাভারতের গল্প এদের হাতে আরো অনেকখানি বেড়ে গেল। এরা ঘটোৎকচের সঙ্গে ভার্গিবা (ভার্গবী) বলে এক মেয়ের ঘটালে বিয়ে। সে- মেয়েটি আবার অর্জুনের কন্যা। বিবাহ সম্বন্ধে এদের প্রথা য়ুরোপের কাছাকাছি যায়। খুড়তোত জাঠতোত ভাইবোনে বাধা নেই। ভার্গিবার গর্ভে ঘটোৎকচের একটি ছেলেও আছে, তার নাম শশিকিরণ। যা হোক, আজকের নাচের বিষয়টা হচ্ছে, প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বিরহী ঘটোৎকচের ঔৎসুক্য। এমন কি, মাঝে মাঝে মূর্ছার ভাবে সে মাটিতে বসে পড়ছে, কল্পনায় আকাশে তার ছবি দেখে সে ব্যাকুল। অবশেষে আর থাকতে না পেরে প্রেয়সীকে খুঁজতে সে উড়ে চলে গেল। এর মধ্যে একটি ভাববার জিনিস আছে। য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয় নি। চাদরখানা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ওড়ার ভাব দেখিয়েছে। এর থেকে মনে পড়ে

গেল শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশবাক্য–রথবেগং নাটয়তি। বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হত, রথের দ্বারা নয়।

রামায়ণের মহাভারতের গল্প এ দেশের লোকের মনকে জীবনকে যে কিরকম গভীরভাবে অধিকার করেছে তা এই কদিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে, বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নতুন আমদানি হবার অনতিকাল পরেই দেখতে দেখতে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে; এমন কি, যেখান থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের এমন অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এদের চিত্তক্ষেত্রে তেমনি করে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্‌বোধন কলারচনায় নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। সেই প্রকাশের অপর্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল বরোবুদরের মূর্তিকল্পনায়। আজ এখানকার মেয়েপুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিতকথাকে নৃত্যমূর্তিতে প্রকাশ করছে; ছন্দে ছন্দে এদের রক্তপ্রবাহে সেই-সকল কাহিনী ভাবের বেগে আন্দোলিত।

এ ছাড়া কত রকম-বেরকমের অভিনয়, তার অধিকাংশই এই-সকল বিষয় নিয়ে। বাইরের দিকে ভারতবর্ষের থেকে এরা বহু শতাব্দী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তবু এতকাল এই রামায়ণ মহাভারত নিবিড়ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই এদের রক্ষা করে এসেছে। ওলন্দাজরা এই দ্বীপগুলিকে বলে “ডাচ ইণ্ডীস’, বস্তুত এদের বলা যেতে পারে “ব্যাস ইণ্ডীস’ ।

পূর্বেই বলেছি, এরা ঘটোৎকচের ছেলের নাম রেখেছে শশিকিরণ। সংস্কৃত ভাষা থেকে নাম রচনা এদের আজও চলেছে। মাঝে মাঝে নামকরণ অদ্ভুতরকম হয়। এখানকার রাজবৈদ্যের উপাধি ক্রীড়নির্মল। আমরা যাকে নিরাময় বা নীরোগ বলে থাকি এরা নির্মল শব্দকে সেই অর্থ দিয়েছে। এদিকে ক্রীড় শব্দ আমাদের অভিধানে খেলা, কিন্তু ক্রীড় বলতে এখানে বোঝাচ্ছে উদ্যোগ। রোগ দূর করাতেই যার উদ্যোগ সেই হল

ক্রীড়নির্মল। ফসলের খেতে যে সেঁচ দেওয়া হয় তাকে এরা বলে সিন্ধু-অমৃত। এখানে জল অর্থেই সিন্ধু- কথার ব্যবহার, ক্ষেত্রকে যে-জলসেঁচ মৃত্যু থেকে বাঁচায় সেই হল সিন্ধু-অমৃত। আমাদের গৃহস্বামীর একটি ছেলের নাম সরোষ, আর-একটির নাম সন্তোষ। বলা বাহুল্য, সরোষ বলতে এখানে রাগী মেজাজের লোক বোঝায় না, বুঝতে হবে সতেজ। রাজার মেয়েটির নাম কুসুমবর্ধিনী। অনন্তকুসুম, জাতিকুসুম, কুসুমায়ুধ, কুসুমব্রত, এমন সব নামও শোনা যায়। এদের নামে যেমন বিশুদ্ধ ও সুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এমনতরো আমাদের দেশে দেখা যায় না। যেমন আত্মসুবিজ্ঞ, শাস্ত্রাত্ম, বীরপুস্তক, বীর্যসুশাস্ত্র, সহস্রপ্রবীর, বীর্যসুব্রত, পদ্মসুশাস্ত্র, কৃতাধিরাজ, সহস্রসুগন্ধ, পূর্ণপ্রণত, যশোবিদগ্ধ, চক্রাধিরাজ, মৃতসঞ্জয়, আর্যসুতীর্থ, কৃতস্মর, চক্রাধিব্রত, সূর্যপ্রণত, কৃতবিভব।

সেদিন যে-রাজার বাড়িতে গিয়েছিলেম তাঁর নাম সুসুহুনন পাকু-ভুবন। তাঁরই এক ছেলের বাড়িতে কাল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তাঁর নাম অভিমন্যু। এঁদের সকলেরই সৌজন্য স্বাভাবিক, নম্রতা সুন্দর। সেখানে মহাভারতের বিরাটপর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এ দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখি নি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে; তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাতপাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক-একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প-অনুসারে ছবিগুলিকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে গামেলান বাজে। এ যেন মহাভারতশিক্ষার একটা ক্লাসে পাঠের সঙ্গে ছবির অভিনয়-যোগে বিষয়টা মনে মুদ্রিত করে দেওয়া। মনে করো, এমনি করে যদি স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়, মাস্টারমশায় গল্পটা বলে যান আর- একজন পুতুল-খেলাওয়ালা প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো পুতুলের অভিনয় দিয়ে দেখিয়ে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব-অনুসারে নানা সুরে তালে বাজনা বাজে, ইতিহাস শেখাবার এমন সুন্দর উপায় কী আর হতে পারে।

মানুষের জীবন বিপদসম্পদ-সুখদুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদের চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়। এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্বদাই দোলায়িত করে রেখেছে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝরনাধারায় কেবলই এদের জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ-মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণবান উপায়ে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা। শিক্ষার বিষয়কে একান্ত করে গ্রহণ ও ধারণ করবার প্রকৃষ্ট প্রণালী কী তা যেন সমস্ত দেশের লোকে মিলে উদ্ভাবন করেছে; রামায়ণ-মহাভারতকে গভীর করে পাবার আগ্রহে ও আনন্দেই এই উদ্ভাবনা স্বাভাবিক হল।

কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প-বলা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ নয়; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও সুরের নাচ। কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত, কখনো প্রবল, কখনো মৃদু, এই সংগীতটাও সংগীতের জন্যে নয়, কোনো-একটা কাহিনীকে নৃত্যচ্ছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্যে।

দীপালোকিত সভায় এসে যখন প্রথম বসলুম তখন ব্যাপারখানা দেখে কিছুই বুঝতে পারা গেল না। বিরক্ত বোধ হতে লাগল। খানিক বাদে আমাকে পটের পশ্চাৎভাগে নিয়ে গেল। সেদিকে আলো নেই, সেই অন্ধকার ঘরে মেয়েরা বসে দেখছে। এদিকটাতে ছবিগুলি অদৃশ্য, ছবিগুলিকে যে-মানুষ নাচাচ্ছে তাকেও দেখা যায় না কেবল আলোকিত

পটের উপর অন্য পিঠের ছবির ছায়াগুলি নেচে বেড়াচ্ছে। যেন উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ। জ্যোতির্লোকে যে-সৃষ্টিকর্তা আছেন তিনি যখন নিজের সৃষ্টিপটের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন তখন আমরা সৃষ্টিকে দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টির অবিশ্রাম যোগ আছে বলে যে জানে সে-ই তাকে সত্য বলে জানে। সেই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই চঞ্চল ছায়াগুলোকে নিতান্তই মায়া বলে বোধ হয়। কোনো কোনো সাধক পটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপারে গিয়ে দেখতে চায়, অর্থাৎ, সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে দেখবার চেষ্টা–কিন্তু তার মতো মায়া আর কিছুই হতে পারে না। ছায়ার খেলা দেখতে দেখতে এই কথাটাই কেবল আমার মনে হচ্ছিল।

আমি যখন চলে আসছি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে খুব একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। বড়ো একটি বাটিক শিল্পের কাপড়। বললেন, এইরকমের বিশেষ কাপড় রাজবংশের ছেলেরা ছাড়া কেউ পরতে পায় না। সুতরাং, এ জাতের কাপড় আমি কোথাও কিনতে পেতুম না।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হল। কাল যাব যোগ্যকর্তায়। সেখানকার রাজবাড়িতেও নাচগান প্রভৃতির রীতিপদ্ধতি বিশুদ্ধ প্রাচীনকালের, অথচ এখানকার সঙ্গে পার্থক্য আছে। যোগ্যকর্তা থেকে বোরোবুদর কাছেই; মোটরে ঘণ্টাখানেকের পথ। আরো দিন পাঁচ-ছয় লাগবে এই সমস্ত দেখে শুনে নিতে, তার পরে ছুটি। ইতি

[১৭ সেপ্টেম্বর,১৯২৭। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত]

১৫

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হয়ে এল। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া এদের লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময় বোধ হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কিরকম প্রাণবান হয়ে রয়েছে সে-কথা পূর্বেই লিখেছি। প্রাণবান বলেই এ জিনিসটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তার অনেক বদল হয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার করেছে। সংসারের কর্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায় নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন মূর্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই-সব চরিত্রে। এইজন্যেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেকরকম বদল হয়েছে। কালে কালে বাঙালি গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হয়েছে এও তেমনি। কাল আমরা যে-ছায়াভিনয় দেখতে গিয়েছিলেম তার গল্পাংশটাকে টাইপ করে আমাদের হাতে দিয়েছিল। সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, পড়ে দেখো। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে এটা বাংলায় তর্জমা করে নিয়ো। এ গল্পের বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে দ্রৌপদী নেই। মূল মহাভারতের ক্লীব বৃহন্নলা এই গল্পে নারীরূপে "কেন-বর্দি' নাম গ্রহণ করেছে। কীচক একে দেখেই মুগ্ধ হয় ও ভীমের হাতে মারা পড়ে। এই কীচক জাভানি মহাভারতে মৎস্যপতির শত্রু, পাণ্ডবেরা একে বধ করে বিরাটের রাজার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল।

আমি মঙ্কুনগরো-উপাধিধারী যে-রাজার বাড়ির অলিন্দে বসে লিখছি চারদিকে তার ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর করে অঙ্কিত। অথচ ধর্মে

এঁরা মুসলমান। কিন্তু, হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবীদের বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন করে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূ-বিবরণের গিরিনদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যেই গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, সেটাতে কোনো অপরাধ নেই, কেননা রামায়ণ-মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্তিতে এদের দেশেই বিচরণ করছেন; আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্বজনব্যাপী পরিচয় নেই, সেখানে ক্রিয়াকর্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন করে বিরাজ করেন না।

আজ রাত্রে রাজসভায় জাভানি শ্রোতাদের কাছে আমার “কথা ও কাহিনী’ থেকে কয়েকটি কথা আবৃত্তি করে শোনাব। একজন জাভানি সেগুলি নিজের ভাষায় তর্জমা করে ব্যাখ্যা করবেন। কাল সুনীতি ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে দীপচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেছিলেন। আজ আবার তাঁক সেইটে বলতে রাজা অনুরোধ করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কথা জানতে এঁদের বিশেষ আগ্রহ। ইতি

[১৭ সেপ্টেম্বর,১৯২৭। শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত]

১৬

কল্যাণীয়েষু

রথী, শূরকর্তার মঙ্কুনগরোর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে যোগ্যকর্তায় পাকোয়ালাম-উপাধিধারী রাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছি। শূরকর্তা শহরে একটি নতুন সাঁকো ও রাস্তা তৈরি শেষ হয়েছে, সেই রাস্তা পথিকদের ব্যবহারের জন্যে মুক্ত করে দেবার ভার আমার উপরে ছিল। সাঁকোর সামনে রাস্তা আটকে একটা কাগজের ফিতে টাঙানো ছিল, কাঁচি দিয়ে সেটা কেটে দিয়ে পথ খোলসা করা গেল। কাজটা আমার লাগল ভালো; মনে হল, পথের বাধা দূর করাই আমার ব্রত। আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে।

পথে আসতে পেরাম্বান বলে এক জায়গায় পুরোনো ভাঙা মন্দির দেখতে নামলুম। এ জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো, মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট মন্দিরগুলিকে তার সাবেক মূর্তিতে গড়ে তুলেছেন। কাজটা খুব কঠিন, অল্প অল্প করে এগোচ্ছে; দুই-একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই কাজে নিযুক্ত। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দ পেলুম। এই কাজ সুসম্পূর্ণ করবার জন্যে আমাদের পুরাণগুলি নিয়ে এঁরা যথেষ্ট আলোচনা করছেন। অনেক জিনিস মেলে না, অথচ সেগুলি যে জাভানি লোকের স্মৃতিবিকার থেকে ঘটেছে তা নয়, তখনকার কালের ভারতবর্ষের লোকব্যবহারের মধ্যে এর ইতিহাস নিহিত। শিবমন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্তিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা জিনিস ভেবে দেখবার বিষয়। শিবকে এ দেশে গুরু, মহাগুরু ব’লে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন; মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠাপড়া, সে তাঁরই নাচের ছন্দে; তিনি

ভৈরব, কেননা, তাঁর লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। এক দিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত; আর-এক দিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন-পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে। কিন্তু, জাভায় কালীর কোনো পরিচয় নেই। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলারও কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। পূতনাবধ প্রভৃতি অংশ আছে কিন্তু গোপীদের দেখতে পাই নে। এর থেকে সেই সময়কার ভারতের ইতিহাসের কিছু ছবি পাওয়া যায়। এখানে রামায়ণ-মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্তত সংস্কৃত মহাকাব্যে ও বাংলাদেশে অপ্রচলিত। এখানকার পণ্ডিতদের মত এই যে, জাভানিরা ভারতবর্ষে গিয়ে অথবা জাভায় সমাগত ভারতীয়দের কাছ থেকে লোকমুখে-প্রচলিত নানা গল্প শুনেছিল, সেইগুলোই এখানে রয়ে গেছে। অর্থাৎ, সে সময়ে ভারতবর্ষেই নানা স্থানে নানা গল্পের বৈচিত্র্য ছিল। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো পণ্ডিতই রামায়ণ-মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। করতে গেলে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় ভাষায় যে-সব কাব্য আছে মূলের সঙ্গে সেইগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার হয়। কোনো এক সময়ে কোনো এক জার্মান পণ্ডিত এই কাজ করবেন বলে অপেক্ষা করে আছি। তার পরে তাঁর লেখার কিছু প্রতিবাদ কিছু সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ডাক্তার উপাধি পাব।

এখানে পাকোয়ালাম লোকটিকে বড়ো ভালো লাগল। শান্ত, গম্ভীর, শিক্ষিত, চিন্তাশীল। জাভার প্রাচীন কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে রক্ষা করবার জন্যে উৎসুক। যোগ্যকর্তার প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন এখানকার সুলতান। তাঁর বাড়িতে রাত্রে নাচ দেখবার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের কাছে শোনা গেল যে, এই জায়গাটির নাম ছিল অযোধ্যা; ক্রমে তারই অপভ্রংশ হয়ে এখন যোগ্যা নামে এসে ঠেকেছে।

এখানে যে- নাচ দেখলুম সে চারজন মেয়ের নাচ। রাজবংশের মেয়েরাই নাচেন। চারজনের মধ্যে দুজন ছিলেন সুলতানেরই মেয়ে। এখানে এসে যত নাচ দেখেছি সব চেয়ে এইটেই সুন্দর লেগেছে। বর্ণনা দ্বারা এ বোঝানো অসম্ভব। এমন অনিন্দ্যসম্পূর্ণ

রূপসৃষ্টি দেখা যায় না। এই-সব নাচের একটা দিক আছে যেটা এর বাইরের সৌন্দর্য, আর-একটা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর বিশেষ অর্থ আছে। যারা সেগুলি জানে তারাই এর শোভার সঙ্গে এর ভাষাকে মিলিয়ে সম্পূর্ণ আনন্দ পেতে পারে। এখানে নাচশিক্ষার বিদ্যালয় আছে, সেখানে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। সেখানে গেলে এদের নাচের তত্ত্ব আরো কিছু বুঝতে পারব, আশা করছি।

আজ রাত্রে রামায়ণ থেকে যে- অভিনয় হবে তার একটি সূচীপত্র পাঠাই। এটা পড়লে বোঝা যায়, এখানকার রামায়ণকথার ভাবখানা কী।

বৌমা পয়লা অগস্টে যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন আজ দেড় মাস পরে সেটি আমার হাতে এল। আমার চিঠির কোন্‌গুলো তোমাদের কাছে পৌঁছল কোন্‌গুলো পৌঁছল না, তা কেমন করে জানব। ইতি

[১৯ সেপ্টেম্বর,১৯২৭]

১৭

কল্যাণীয়াসু

রানী, এখানকার পালা শেষ হয়ে এল, শরীরটাও ক্লান্ত। এখানে যে-রাজার বাড়িতে আছি কাল রাত্রে তিনি ছায়াভিনয়ের একটি পালা দেখাবেন; তার পরে আমরা যাব বরোবুদরে। সেখানে দুদিন কাটিয়ে ফেরবার পথে বাটাভিয়াতে গিয়ে জাহাজে চড়ে বসব।

কাল রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিলুম জটায়ুবধের অভিনয় দেখতে। দেখে এ দেশের লোকের মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যাকে অভিনয় বলি তার প্রধান অংশ কথা, বাকি অংশ হচ্ছে নানাপ্রকার হৃদয়ভাবের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর প্রতিরূপ দেখানো। এখানে তা নয়। এখানে প্রধান জিনিস হচ্ছে ছবি এবং গতিচ্ছন্দ। কিন্তু, সেই ছবি বলতে প্রতিরূপ নয়, মনোহর রূপ। আমরা সংসারে যে দৃশ্য সর্বদা দেখি তার সঙ্গে খুব বেশি অনৈক্য হলেও এদের বাধে না। পৃথিবীতে মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করে থাকে। এই অভিনয়ে সবাইকে বসে বসে চলতে ফিরতে হয়। সেও সহজ চলাফেরা নয়, প্রত্যেক নড়াচড়া নাচের ভঙ্গীতে। মনে মনে এরা এমন একটা কল্পলোক সৃষ্টি করেছে যেখানে সবাই বসার অবস্থায় নেচে বেড়ায়। এই পঙ্গু মানুষের দেশ যদি প্রহসনের দেশ হত তা হলেও বুঝতুম। একেবারেই তা নয়, এ মহাকাব্যের দেশ। এরা স্বভাবকে খাতির করতে চায় না। স্বভাব তার প্রতিশোধস্বরূপে যে এদের বিদ্রূপ করবে, এদের হাস্যকর করে তুলবে, তাও ঘটল না। স্বভাবের বিকারকেও এরা সুদৃশ্য করবে, এই এদের পণ। ছবিটাই এদের লক্ষ্য, স্বভাবের অনুকরণ এদের লক্ষ্য নয়, এই কথাটা এরা যেন স্পর্ধার সঙ্গে বলতে চায়। মনে করো-না কেন, প্রথম দৃশ্যটা রাজসভায় দশরথ ও তাঁর অমাত্যবর্গ। রঙ্গভূমিতে এরা সবাই গুঁড়ি মেরে প্রবেশ করল। মনে হয়, এর চেয়ে অদ্ভুত কিছুই হতে পারে না। ব্যাপারটাকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো কত কঠিন ভেবে দেখো।

কিন্তু, এতে আমরা বিরূপ কিছুই দেখলুম না, এরা দশরথ কিম্বা রাজামাত্য সে কথাটা সম্পূর্ণ গৌণ হয়ে গেল। পরের দৃশ্যে কৈকেয়ী প্রভৃতি রানী আর সখীরা তেমনি করেই বসা-অবস্থায় হেলে দুলে নেচে নেচে প্রবেশ করলে। আট-নয় বছরের ছেলেরা সব কৌশল্যা প্রভৃতি রানী সেজেছে। এদিকে কৌশল্যার ছেলে রাম যে সেজেছে তার বয়স অন্তত পঁচিশ হবে; এটা যে কত বড়ো অসংগত সে প্রশ্ন কারো মনেই আসে না, কেননা, এরা দেখছে ছবির নাচ। যতক্ষণ সেটাতে কোনো দোষ ঘটছে না ততক্ষণ নালিশ করবার কোনো হেতু নেই। অন্য দেশের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করে, এর মানে কী হলো, এরা বলে, "তা আমরা জানি নে, কিন্তু আমাদের "রসম্' তৃপ্ত হচ্ছে।" অর্থাৎ, মানে না পাই রস পাচ্ছি। আমাকে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত বলছিলেন, বালির লোকেরা অভ্যাসমতো যে-সব পূজানুষ্ঠান করে তার মানে তারা কিছুই বোঝে না কিন্তু তারাও "রসম্'-তৃপ্তির দোহাই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, সৌন্দর্যের, সম্পূর্ণতার একটা আইডিয়া তাদের মনের ভিতরে আছে, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সেইটিতে যখন সাড়া পায় তখন তাদের যে- আনন্দ তাকে তো আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে।

কাল রাত্রে এই রঙ্গক্ষেত্রের বহিরঙ্গনে কত- যে লোক জমেছে তার সংখ্যা নেই। নিঃশব্দে তারা দেখছে; শুধু কেবল দেখারই সুখ। তাদের মনের মধ্যে রামায়ণের গল্প আছে, সেই গল্পের ধারার সঙ্গে ছবির ধারা মিলে কল্পনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয়টা হচ্ছে এই যে, যে-ছবিটা দেখছে সেটাতে গল্পকে ফুটিয়ে তোলবার কোনো চেষ্টা নেই। রামের যৌবরাজ্যে কৈকেয়ী রাগ করেছে; কিন্তু যেরকম ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে আমাদের চোখে কানে রাগের ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ছবির মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আট-দশ বছরের ছেলে স্ত্রীবেশে কৈকেয়ী সাজলে তার মধ্যে কৈকেয়ীত্ব লেশমাত্র থাকা অসম্ভব। তবু এরা তাতে কোনো অভাব বোধ করে না। জিনিসটা যদি আগাগোড়া ছেলেমানুষি ও গ্রাম্য বর্বর-গোছের কিছু হত তা হলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই থাকত না-কিন্তু, যেখানে নৈপুণ্য ও সৌষম্যের সীমা নেই, অতি সামান্য ভঙ্গীটুকুমাত্র যেখানে নিরর্থক নয়, বহু যত্ন ও বহু শক্তির দ্বারা যেখানে এই ললিতকলাটি একেবারে সুপরিণত হয়ে উঠেছে, সেখানে একে অবজ্ঞা করা চলে না। এই কথাই বলতে

হয় যে, রূপের ও গতির ছন্দবোধ এদের মনে অত্যন্ত বেশি প্রবল; সেই রূপের ও গতির ভাষা এদের মনে যতখানি কথা কয় আমাদের মনে ততখানি কয় না। এদের গামেলান-সংগীতেও সেটা দেখতে পাই। প্রথমত যন্ত্রগুলি বহুসংখ্যক, বহু যত্নে সুশোভিত, এবং তাদের সমাবেশ সুসজ্জিত, যারা বাজাচ্ছে তাদের মধ্যে সংযত শোভনতা। এই রম্যদর্শন এদের কাছে অত্যাবশ্যক। চোখের দেখার সুখটুকু রক্ষা করে এদের যে সংগীতের আলোচনা সে হচ্ছে সুরের নাচ। ছন্দের লীলা এদের কাছে গীতের ধারার চেয়ে বেশি। কিন্তু, ছন্দের লীলা আমাদের দেশের ভোজপুরিয়াদের খচ্‌মচ্‌ বাদ্যের দুঃসহ অত্যাচার নয়। এদের নাচ যেমন সুন্দর সজ্জিত অঙ্গের নাচ, এদের সংগীতে যে ছন্দের নাচ সেও খোল করতাল মৃদঙ্গের কোলাহল নয়-সুশ্রাব্য সুর দিয়ে সেই নাচ মণ্ডিত। এদের সংগীতকে বলা যেতে পারে স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য। ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন, তিনি এদের যে-বর দিয়েছেন সে হচ্ছে তাঁর নাচটি–আর, আমাদের জন্যে কি কেবল তাঁর শ্মশানভস্মই রইল। ইতি

[জাভা, যোগ্যকর্তা। ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭]

১৮

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা একটি সন্দুর জায়গায় এসেছি। পাহাড়ের উপরে–শোনা গেল পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু, হিমালয়ের এতটা উঁচু কোনো পাহাড়ে যতটা শীত এখানে তার কাছ দিয়েও যায় না। আমরা আছি ডীমন্‌ট বলে এক ভদ্রলোকের আতিথ্যে। এঁর স্ত্রী অষ্ট্রীয়, ভিয়েনার মেয়ে। বাগান দিয়ে বেষ্টিত সুন্দর বাড়িটি পাহাড়ের উপর। এখান থেকে ঠিক সামনেই দেখতে পাই নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বাণ্ডুঙ শহর। পাহাড়ের যে- অঞ্জলির মধ্যে এই শহর, অনতিকাল আগে সেখানে সরোবর ছিল। কখন্ একসময় পাড়ি ধসে গিয়ে তার সমস্ত জল বেরিয়ে চলে গেছে। এতদিন ঘোরাঘুরির পরে এই সুন্দর নির্জন জায়গায় নিভৃত বাড়িতে এসে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে।

জাভাতে নামার পর থেকেই যিনি সমস্তক্ষণ অশ্রান্ত যত্নে আমাদের সাহচর্য করে আসছেন তাঁর নাম সামুয়েল কোপের্‌বর্‌গ্। নামের মূল অর্থ হচ্ছে তামার পাহাড়। সুনীতি সেই মানেটা নিয়ে তাঁর নামের সংস্কৃত অনুবাদ করে দিয়েছেন তাম্রচূড়। আমাদের মহলে তাঁর এই নামটিই চলে গিয়েছে, তিনি এতে আনন্দিত। লোকটির নাম বদলে তাঁকে স্বর্ণচূড় বলতে ইচ্ছে করে। কিসে আমাদের লেশমাত্র আরাম সুবিধা বা দাবি পূর্ণ হতে পারে সেজন্যে তিনি অসাধারণ চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন। অকৃত্রিম সৌহার্দ্য তাঁর। দৈহিক পরিমাণে মানুষটি সংকীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে খুব প্রশস্ত। এতকাল আমরা তাঁকে নানা সময়ে নানা উপলক্ষে দিনরাত ধ'রে দেখেছি–কখনো তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য বা ক্ষুদ্রতা বা অহমিকা দেখি নি। সব সময়েই দেখেছি, নিজেকে তিনি সকলের শেষে রেখেছেন। তাঁর শরীর রুগ্‌ণ ও দুর্বল, অথচ সেই রুগ্‌ণ শরীরের জন্যে কোনোদিন কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করেন নি। সকলের সব হয়ে গিয়ে যেটুকু উদ্‌বৃত্ত সেইটুকুতেই তাঁর অধিকার।

অনেকের কাছে তিনি তর্জন সহ্য করেছেন কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন তাঁর কাছে থেকে নালিশ বা কারো নিন্দে শুনি নি। ইংরিজি ভালো বলতে পারেন না, বুঝতেও বাধে। কিন্তু, কথায় যা না কুলোয় কাজে তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেন। কোথাও যাতায়াতের সময় মোটরগাড়িতে প্রথম প্রথম তিনি আমাদের সঙ্গ নিতেন, কিন্তু যেই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন, অমনি অকুণ্ঠিত মনে নিজেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজি-জানা সঙ্গীদের জন্যে স্থান করে দিলেন। কিন্তু, এখন এমন হয়েছে, তিনি সঙ্গে না থাকলে কেবল যে অসুবিধা হয় তা নয়, আমার তো ভালোই লাগে না। আমাদের মানসম্মান-সুখ-স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় তিনি নিজেকে এমন সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন যে, তিনি একটু সরে গেলেই আমাদের বড়ো বেশি ফাঁক পড়ে। তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের একটি লক্ষণ দেখে আমার ভারি ভালো লাগে–সর্বত্রই দেখি, শিশুদের তিনি বন্ধু, তারা ওঁকে নিজেদের সমবয়সী বলেই জানে। তাঁর হৃদয়ের আর-একটি প্রমাণ, জাভার লোকদের তিনি সম্পূর্ণ আপন করে নিয়েছেন। জাভানিদের নাচ গান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর একান্ত যত্ন। এই সমস্ত আলোচনার জন্যে “জাভা সোসাইটি’ বলে একটি সভা স্থাপিত হয়েছে, তারই পরিচালনার জন্যে এঁর সমস্ত সময় ও চেষ্টা নিযুক্ত। আমার বর্ণনা থেকে বুঝবে, এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেছি।

বোরোবুদুরের উদ্দেশে যে কবিতা’ লিখেছি সেটি অন্য পাতায় তোমাদের জন্যে কপি করে পাঠানো গেল। ইতি

[ডাগো বাণ্ডুঙ। যবদ্বীপ। ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭]

১৯

কল্যাণীয়াসু

মীরা, এখানকার যা-কিছু দেখবার তা শেষ করেছি। যোগ্য থেকে গিয়েছিলুম বোরোবুদুরে; সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে এলুম।

প্রথমে দেখলুম, মুণ্ডুঙ বলে এক জায়গায় একটি ছোটো মন্দির। ভেঙেচুরে পড়ছিল, সেটাকে এখানকার গবর্মেণ্ট সারিয়ে নিয়েছে। গড়নটি বেশ লাগল দেখতে। ভিতরে বুদ্ধের তিন ভাবের তিন বিরাট মূর্তি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেম। মনের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ হয়। একদিন অনেক মানুষে মিলে এই মন্দির, এই মূর্তি, তৈরি করে তুলছিল। সে কত কোলাহল, কত আয়োজন, তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল মানুষের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড পাথরের প্রতিমা যেদিন পাহাড়ের উপর তোলা হচ্ছিল সেদিন এই গাছপালার মধ্যে এই সূর্যালোকে উজ্জ্বল আকাশের নীচে মানুষের বিপুল একটা প্রয়াস সজীবভাবে এইখানে তরঙ্গিত। পৃথিবীতে সেদিন খবর-চালাচালি ছিল না; এই ছোটো দ্বীপটির মধ্যে যে প্রবল ইচ্ছা আপন কীর্তিরচনায় প্রবৃত্ত, সমুদ্র পার হয়ে তার সংবাদ আর কোথাও পৌঁছয় নি। কলকাতার ময়দানের ধারে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হচ্ছিল তার কোলাহল পৃথিবীর সকল সমুদ্রের কূলে কূলে বিস্তীর্ণ হয়েছিল।

নিশ্চয় দীর্ঘকাল লেগেছিল এই মন্দির তৈরি হতে; কোনো-একজন মানুষের আয়ুর মধ্যে এর সৃষ্টির সীমা ছিল না। এই মন্দিরকে তৈরি করে তোলবার জন্যে যে প্রবল শ্রদ্ধা সেটা তখনকার সমস্ত কাল জুড়ে সত্য ছিল। এই মন্দির নির্মাণ নিয়ে কত বিস্ময়, কত বিতর্ক, সত্যমিথ্যা কত কাহিনী তখনকার এই দ্বীপের সুখদুঃখবিক্ষুব্ধ প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত হয়েছে। একদিন মন্দির তৈরি শেষ হল; তার পরে দিনের পর

দিন এখানে পূজার দীপ জ্বলেছে, দলে দলে পূজার অর্ঘ্য এনেছে, বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পার্বণ হয়েছে, এর প্রাঙ্গণে তীর্থযাত্রী মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় করেছে।

তার পরে সেদিনের ভাষার উপর, ভাবের উপর, ধুলো চাপা পড়ল; সেদিন যা অত্যন্ত সত্য ছিল তার অর্থ গেল হারিয়ে। ঝরনা শুকিয়ে গেলে যেমন কেবল পাথরগুলো বেরিয়ে পড়ে, এই-সব মন্দির আজ তেমনি। একে ঘিরে যে- প্রাণের ধারা নিরন্তর বয়ে যেত সে যেমনি দূরে সরে গেল, অমনি এর পাথর আর কথা কয় না, এর উপরে সেদিনের প্রাণস্রোতের কেবল চিহ্নগুলি আছে, কিন্তু তার গতি নেই, তার বাণী নেই। মোটরগাড়ি চড়ে আমরা একদল এলুম দেখতে, কিন্তু দেখবার আলো কোথায়। মানুষের এই কীর্তি আপন প্রকাশের জন্যে মানুষের যে-দৃষ্টির অপেক্ষা করে, কতকাল হল, সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

এর আগে বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেছি। তার গড়ন আমার চোখে কখনোই ভালো লাগে নি। আশা করেছিলুম হয়তো প্রত্যক্ষ দেখলে এর রস পাওয়া যাবে। কিন্তু, মন প্রসন্ন হল না। থাকে-থাকে একে এমন ভাগ করেছে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো যে, যত বড়োই এর আকার হোক এর মহিমা নেই। মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাকনা চাপা দিয়েছে। এটা যেন কেবলমাত্র একটা আধারের মতো, বহুশত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে মস্ত একটি ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে দেখলে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়। পাথরে-খোদা জাতকমূর্তিগুলি আমার ভারি ভালো লাগল– প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই। অন্য মন্দিরে দেখেছি সব দেবদেবীর মূর্তি, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও খোদাই হয়েছে। এই মন্দিরে দেখতে পাই সর্বজনকে–রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারি পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে, যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ

প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয় কেননা, আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালীপরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের ‘পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে-পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধচক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই-যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না। কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়ে চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যেই

এতবড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

দুজন ওলন্দাজ পণ্ডিত সমস্ত ভালো করে ব্যাখ্যা করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরল হৃদ্যতার সম্মিলন আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। সব চেয়ে শ্রদ্ধা হয় এঁদের নিষ্ঠা দেখে। বোবা পাথরগুলোর মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে সমস্ত আয়ু দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কৃপণতা লেশমাত্র নেই– অজস্র দাক্ষিণ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করে জেনে নেবার জন্যে এঁদেরই গুরু বলে মেনে নিতে হবে। জ্ঞানের প্রতি বিশুদ্ধ নিষ্ঠা থেকেই এঁদের এই অধ্যবসায়। ভারতের বিদ্যা, ভারতের ইতিহাস, এঁদের নিকটের জিনিস নয়, অথচ এইটেই এঁদের সমস্ত

জীবনের সাধনার জিনিস। আরো কয়েকজন পণ্ডিতকে দেখেছি; তাঁদের মধ্যেও সহজ নম্রতা দেখে আমার মন আকৃষ্ট হয়েছে। ইতি

[বাণ্ডুঙ জাভা। ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭]

২০

কল্যাণীয়াসু

রানী, জাভার পালা সাঙ্গ করে যখন বাটাভিয়াতে এসে পৌঁছলুম, মনে হল খেয়াঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি, এবার পাড়ি দিলেই ওপারে গিয়ে পৌঁছব নিজের দেশে। মনটা যখন ঠিক সেই ভাবে ডানা মেলেছে এমন সময় ব্যাংকক্ থেকে আরিয়ামের টেলিগ্রাম এল যে, সেখানে আমার ডাক পড়েছে, আমার জন্যে অভ্যর্থনা প্রস্তুত। আবার হাল ফেরাতে হল। সারাদিন খাটুনির পর আস্তাবলের রাস্তায় এসে গাড়োয়ান যখন নতুন আরোহীর ফরমাশে ঘোড়াটাকে অন্য রাস্তায় বাঁক ফেরায় তখন তার অন্তঃকরণে যে-ভাবের উদয় হয় আমার ঠিক সেইরকম হল। ক্লান্ত হয়েছি, এ কথা মানতেই হবে। এমন লোক দেখেছি (নাম করতে চাই নে) ভাগ্য অনুকূল হলে যারা টুরিস্ট্‌ব্রত গ্রহণ করে চিরজীবন অসাধ্য সাধন করতে পারত, কিন্তু তারা হয়তো পটলডাঙার কোন্-এক ঠিকানায় ধ্রুব হয়ে গৃহকর্মে নিযুক্ত। আর, আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গগনপথে ওড়াতে পারলে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্ছে। অতএব, চললুম শ্যামের পথে, ঘরের পথে নয়।

এখানকার যে-সরকারি জাহাজে সিঙাপুরে যাবার কথা সে-জাহাজে অত্যন্ত ভিড়, তাই একটি ছোটো জাহাজে আমি আর সুরেন স্থান করে নিয়েছি। কাল শুক্রবার সকালে রওনা হওয়া গেছে। সুনীতি ও ধীরেন একদিনের জন্য পিছিয়ে রয়ে গেল; কেননা, কাল রাত্রে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সুনীতির একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। জাভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সুনীতি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তার কারণ, তাঁর পাণ্ডিত্যে কোনো ফাঁকি নেই, যা-কিছু বলেন তা তিনি ভালো করেই জানেন।

আমাদের জাহাজ দুটি দ্বীপ ঘুরে যাবে, তাই দুদিনের পথে তিন দিন লাগবে। এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে। সেগুলো ওলন্দাজদের দখলে। এখন যে-দ্বীপে জাহাজ নোঙর ফেলেছে তার নাম বিলিটন। মানুষ বেশি নেই; আছে টিনের খনি, আর আছে সেইসব খনির ম্যানেজার ও মজুর। আশ্চর্য হয়ে বসে বসে ভাবছি, এরা সমস্ত পৃথিবীটাকে কিরকম দোহন করে নিচ্ছে। একদিন এরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে পালের জাহাজে চড়ে অজানা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলে, চিনে নিলে, মেপে নিলে। সেই জেনে নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস কত সাংঘাতিক সংকটে আকীর্ণ। মনে মনে ভাবি, ওদের স্বদেশ থেকে অতি দূর সমুদ্রকূলে এই-সব দ্বীপে যেদিন ওরা প্রথম এসে পাল নামালে, সে কত আশঙ্কায় অথচ কত প্রত্যাশায় ভরা দিন। গাছপালা জীবজন্তু মানুষজন সেদিন সমস্তই নতুন। আর আজ! সমস্তই সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অধিকৃত।

এদের কাছে আমাদের হার মানতে হয়েছে। কেন, সেই কথা ভাবি। তার প্রধান কারণ, আমরা স্থিতিবান জাত, আর ওরা গতিবান। অন্যোন্যতন্ত্র সমাজবন্ধনে আমরা আবদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে ওরা বেগবান। সেইজন্যেই এত সহজে ওরা ঘুরতে পারল। ঘুরেছে ব'লেই জেনেছে আর পেয়েছে। সেই কারণেই জানবার ও পাবার আকাঙক্ষা ওদের এত প্রবল। স্থির হয়ে বসে থেকে আমাদের সেই আকাঙক্ষাটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে। ঘরের কাছেই কে আছে, কী হচ্ছে, ভালো করে তা জানি নে, জানবার ইচ্ছাও হয় না। কেননা, ঘর দিয়ে আমরা অত্যন্ত ঘেরা। জানবার জোর নেই যাদের, পৃথিবীতে বাঁচবার জোর তাদের কম। এই ওলন্দাজরা যে-শক্তিতে জাভাদ্বীপ সকলরকমে অধিকার করে নিয়েছে, সেই শক্তিতেই জাভাদ্বীপের পুরাতত্ত্ব অধিকার করার জন্যে তাদের এত পণ্ডিতের এত একাগ্রমনে তপস্যা। অথচ, এ পুরাতত্ত্ব অজানা নতুন দ্বীপেরই মতো তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য। নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন, দূরসম্পর্কীয় জ্ঞান সম্বন্ধেও এঁদের আগ্রহের অন্ত নেই। কেবল বাহুবলে নয়, এই জিজ্ঞাসার প্রবলতায় এরা জগৎটাকে অন্তরে বাহিরে জিতে নিচ্ছে। আমরা একান্তভাবে গৃহস্থ। তার মানে, আমরা প্রত্যেকে আপন গার্হস্থ্যের অংশমাত্র, দায়িত্বের হাজার বন্ধনে বাঁধা। জীবিকাগত দায়িত্বের

সঙ্গে অনুষ্ঠানগত দায়িত্ব বিজড়িত। ক্রিয়াকর্মের নিরর্থক বোঝা এত অসহ্য বেশি যে, অন্য সকল যথার্থ কর্ম তারই ভারে অচলপ্রায়। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যে-সমস্ত কৃত্য ইহলোক পরলোক জুড়ে আমাদের স্কন্ধে চেপেছে তাদের নিয়ে নড়াচড়া অসম্ভব, আর তারা আমাদের শক্তিকে কেবলই শোষণ করে নিচ্ছে। এই-সমস্ত ঘরের ছেলেরা পরের হাতে মার খেতে বাধ্য। এ কথাটা আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছি। এইজন্যে আমাদের নেতারা সন্ন্যাসের দিকে এতটা ঝোঁক দিয়েছেন। অথচ, তাঁরা সনাতন ধর্মকেও ধ্রুব সত্য বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমাদের সনাতনধর্ম গার্হস্থ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ। আমাদের দেশে বিস্ত্রীক ধর্মের কোনো মানে নেই।

যাঁরা সনাতনধর্মের দোহাই দেন না, তাঁরা বলেন ক্ষতি কী। কিন্তু, বহু যুগের সমাজব্যবস্থার পুরাতন ভিত্তি যদি-বা ভাঙা সহজ হয় তার জায়গায় নতুন ভিত্তি গড়বে কতদিনে। কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজ কতকগুলি নীতিকে সংস্কারগত করে নিয়েছে। তর্ক ক'রে বিচার ক'রে, অল্প লোক সিধে থাকতে পারে–সংস্কারের জোরেই তারা সংসারের পথে চলে। এক সংস্কারের জায়গায় আর-এক সংস্কার গড়া তো সোজা কথা নয়। আমাদের সমাজের সমস্ত সংস্কারই আমাদের বহুদায়গ্রন্থিল গার্হস্থ্যকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখবার জন্যে। য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে বিজ্ঞান শেখা সহজ কিন্তু তাদের সমাজের সংস্কারকে আপন করা সহজ নয়।

আমাদের জাহাজে ছিলেন টিনখনির এক কর্তা; বললেন, ষোলো বৎসর এইখানেই লেগে আছেন। টিন ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। তবু এইখানেই তাঁর বাসা বাঁধা। বাটাভিয়াতে সিন্ধি বণিকেরা দোকান করেছেন। দু বছর অন্তর বাড়ি যাবার নিয়ম। জিজ্ঞাসা করলুম, স্ত্রীপুত্র নিয়ে এখানে বাসা বাঁধতে দোষ কী। বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এলে চলবে কেন, স্ত্রী-যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে বাঁধা, তাঁকে সরিয়ে আনতে গেলে সেখানে ভাঙন ধরে। বোধ করি রামায়ণের যুগে এ তর্ক ছিল না। টিনের কর্তা বালককাল কাটিয়েছেন সাশ্রম বিদ্যালয়ে, বয়ঃপ্রাপ্ত হতেই কাজের সন্ধানে ফিরেছেন, বিবাহ করবামাত্র নিজের শক্তির 'পরেই সম্পূর্ণ ভর দিয়ে বসেছেন। বাপের তবিলের উপরে

তাগিদ নেই, মা-মাসি-পিসেমশায়ের জন্যেও মন খারাপ হয় না। সেইজন্যেই এই জনবিরল নির্বাসনেও টিনের খনি চলছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এরা ঘর বাঁধতে পারল তার কারণ, এরা ঘরছাড়া। তার পরে মঙ্গলগ্রহের দিকে দূরবীন তুলে-যে এরা রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছে তারও কারণ, এদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি ঘরছাড়া। সনাতন গৃহস্থেরা এদের সঙ্গে কেমন করে পারবে। তাদের প্রচণ্ড গতিবেগে এদের ঘরের খুঁটিগুলো পড়ছে ভেঙে; কিছুতে বাধা দিতে পারছে না। যতক্ষণ চুপ করে আছি ততক্ষণ যত রাজ্যের অহেতুক বোঝা জমে জমে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলেও তেমন দুঃখ বোধ হয় না, এমন কি, ঠেস দিয়ে আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু, ঘাড়ে, তুলে নিয়ে চলতে গেলেই মেরুদণ্ড বাঁকে। যারা সচল জাত, বোঝাই সম্বন্ধে তাদের কেবলই সূক্ষ্ম বিচার করতে হয়। কোন্‌টা রাখবার, কোন্‌টা ফেলবার, এ তর্ক তাদের প্রতি মুহূর্তের; এতেই আবর্জনা দূর করবার বুদ্ধি পাকা হয়। কিন্তু, সনাতন গৃহস্থ চণ্ডীমণ্ডপে আসন পেতে বসে আছেন; তাই তাঁর পঞ্জিকা থেকে তিনশোপঁয়ষট্টি-দিন-ভরা মূঢ়তায় আজ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ল না। এই-সমস্ত রাবিশ যাদের অন্তরে বাহিরে কানায় কানায় ভরপুর, হঠাৎ কংগ্রেসের মাচার উপর থেকে তাদের 'পরে হুকুম এল, লঘুভার মানুষের সঙ্গে সমান পা ফেলে চলতে হবে, কেননা, দু-চার দিনের মধ্যেই স্বরাজ চাই। জবাব দেবার ভাষা তাদের মুখে নেই, কিন্তু তাদের পাঁজর-ভাঙা বুকের ব্যথায় এই মূক মিনতি থেকে যায়, "তাই চলবার চেষ্টা করব, কিন্তু কর্তারা আমাদের বোঝা নামিয়ে দেন।" তখন কর্তারা শিউরে উঠে বলেন, "সর্বনাশ, ও-যে সনাতন বোঝা।" ইতি

[বিলিটন, মায়ার জাহাজ। ১ অক্টোবর, ১৯২৭]

২১

কল্যাণীয়েসু

অমিয়, অক্টোবর শুরু হল, বোধ হচ্ছে এখন তোমাদের পূজোর ছুটি; আন্দাজ করছি, ছুটি ভোগ করবার জন্যে আশ্রম ত্যাগ করা তুমি প্রয়োজন বোধ কর নি। নিশ্চয়ই তোমার ছুটির জোগান দেবার ভার দিয়েছ শান্তিনিকেতনের প্রফুল্লকাশগুচ্ছবীজিত শরৎপ্রকৃতির উপরে। পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্তত এই বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে যে, ঘুরে বেড়িয়ে বেশি কিছু লাভ নেই, এ যেন চালুনিতে জল আনবার চেষ্টা, পথে-পথেই প্রায় সমস্তটা নিকেশ হয়ে যায়। আধুনিক কালের ভ্রমণ জিনিসটা উঞ্ছবৃত্তির মতো, যা ছড়িয়ে আছে তাকে খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলা। নিজের সুদূর ভরা খেতে আঁটিবাঁধা ফসলের স্মৃতিটা মনে কেবলই জেগে ওঠে।

এবারকার যাত্রায় দেশের চিঠিপত্র ও খবরবার্তা প্রায় কিছু পাই নি বলে মনে হচ্ছে যেন জন্মান্তর গ্রহণ করেছি। এ জন্মের প্রত্যেক দিনের স্পেসিফিক গ্রোভিটি সাবেকজন্মের অন্তত সাতদিনের তুল্য। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন ঘটনার চলমান যূথপ্রবাহ একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে হুহু করে চলেছে। এই চলার মাপেই মন তোমাদেরও সময়ের বিচার করছে। রেলগাড়ির আরোহী যেমন মনে করে, তার গাড়ির বাইরে নদীগিরিবন হঠাৎ কালের তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছে, তেমনি এই দ্রুত বেগবান সময়ের কাঁধে চড়ে আমারও মনে হচ্ছে, তোমাদের ওখানেও সময়ের বেগ বুঝি এই পরিমাণেই-সেখানে আজ-গুলো বুঝি কাল-গুলোকে ডিঙিয়ে একেবারে পরশুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে, মুকুলের সঙ্গে ফলের বয়সের ভেদ সেখানে বুঝি ঘুচল। দূরে বসে যখন বোরোবুদর বালি প্রভৃতির কথা ভেবেছি তখন সেই ভাবনাকে একটা বিস্তৃত কালের উপর মেলে দিয়ে কল্পনা করেছি, নইলে অতখানি পদার্থ ধরাবার জায়গা পাওয়া যায় না। এই

কয়দিনেই সে-সমস্ত তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা গেল; যা স্বপ্নের মধ্যে আকীর্ণ হয়ে ছিল তা প্রত্যক্ষের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে এল। দূরে সময়ের যে-মাপ অস্ফুটতার মধ্যে মস্ত হয়ে ছিল, কাছে সেই সময়টাই ঘন হয়ে উঠল। হিসেব করে দেখলে, আমার এই কয়দিনের আয়ুতে অল্পকালের মধ্যে অনেকখানি কালকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে মন্দগমনে যার দিন চলে তার বয়সটার অনেকখানি বাদ দিলে তবে খাঁটি আয়ুটুকুর মধ্যে পৌঁছনো যায়; অর্থাৎ কেবলমাত্র কালের পরিমাণে তার আয়ুর দাম দিতে গেলে ঠকতে হয়, অনেক দর-কষাকষি করেও দুধে পৌঁছনো শক্ত হয়ে ওঠে। তাই ব'লে এ কথা বলাও চলে না যে, দ্রুতবেগে দেশবিদেশে অনেকগুলো ব্যাপার-পরম্পরার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চললেই আয়ু সেই অনুসারে কালকে ব্যাপ্ত করে। আমাদের শাস্ত্রীমশায়কে দেখো-না। তিনি কোণেই বসে আছেন। কিন্তু, সেইটুকুর মধ্যে স্থির হয়ে থেকে কালকে তিনি কিরকম ব্যাপকভাবে অধিকার করতে করতে চলেছেন; সাধারণ লোকের বয়সের বাটখারায় মাপলে তাঁর বয়স নব্বই ছাড়িয়ে যায়। এই তো সেদিন এলেন আশ্রমে মিত্রগোষ্ঠীর সম্পাদকপদ থেকে নেমে। এসেই তাঁর মন দৌড় দিল পালিশাস্ত্রের মহারণ্যের মধ্যে। দ্রুতবেগে পার হয়ে চলেছেন-কোথায় তিব্বতি, কোথায় চৈনিক। নাগাল পাবার জো নেই।

তাই বলছি, আমাদের এই ভ্রমণের কালটা ব্যাপ্তির দিকে যেরকম প্রাপ্তির দিকে সেরকম নয়। আমাদের ভ্রমণের তালটা চৌদূন লয়ে। এই লয় তো আমাদের জীবনের অভ্যস্ত লয় নয়, তাই বাইরের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকে চালাতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়তে হয়। যেমন চিবিয়ে না খেলে খাদ্যটাকে খাদ্য বলেই মনে হয় না তেমনি হুড়মুড় করে কাজ করাকে কর্তব্য বলে উপলব্ধি করা যায় না। বিশ্বের উপর দিয়ে ভাসা-ভাসা ভাবে মন বুলিয়ে চলেছি; অভিজ্ঞতার পেয়ালা ধরে ফেনাটাতে মুখ ঠেকাবার জন্যে এক সেকেণ্ড মেয়াদ পাওয়া যায়, পানীয় পর্যন্ত পৌঁছবার সময় নেই। মৌমাছিকে ঝোড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে কেবল যদি উড়তেই হয়, ফুলের উপর একটুমাত্র পা ছুঁইয়েই তখনই যদি সে ছিটকে পড়ে, তা হলে তার ঘুরে-বেড়ানোটা যেমন ব্যর্থ হয়, আমার মনও তেমনি ব্যর্থতার দমকা হাওয়ায় ভন্‌ভন্‌ করেই মোলো-তার চলার সঙ্গে পৌঁছনোর যোগ হারিয়ে

গেছে। এর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি, কোনো জন্মে আমেরিকান ছিলুম না। পাওয়া কাকে বলে যে-মানুষ জানে না ছোঁওয়াকেই সে পাওয়া মনে করে। আমার মন স্ন্যাপ্‌শট্‌বিলাসী মন নয়, সে চিত্রবিলাসী।

এই মাত্র সুনীতি এসে তাড়া লাগাচ্ছে-বেরোতে হবে, সময় নেই। যেমন কোল্‌রিজ বলে গেছেন–সমুদ্রে জল সর্বত্রই, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই যে, পান করি। সময়ের সমুদ্রে আছি কিন্তু একমুহূর্ত সময় নেই। ইতি

[২ অক্টোবর, ১৯২৭। শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত]